ছন্দ ও অলঙ্কার

ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্ত্তী

এম. এ. (ডবল), পিএইচ. ডি., ডি. লিট

প্রকাশক : শ্রীতপন কুমার বিশ্বাস
৪১, অরুণাচল, সোদপুর
উত্তর ২৪ পরগণা

পরিবেশক : বীণা লাইব্রেরী, কলেজ হোস্টেল রোড,
পানবাজার, গৌহাটী—১ (আসাম)

মুদ্রক : বনলতা আর্ট প্রিন্টার্স
সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা

আত্মজা

টুকু ও কুমুকে

বাবা

ভূমিকা

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ সালে। প্রকাশক ছিলেন **ইষ্টার্ণ বুক এজেন্সী,** (কোলকাতা)। বিগত কয়েক বৎসর ধরে বইটি বাজারে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। বইটির জন্য তাগিদ পেয়েছি বহু। অপেক্ষা করছিলাম ইষ্টার্ণ বুক এজেন্সী "ইষ্টার্ণ এরিয়া'র লেখকের বইটি ছাপেন কিনা। কিন্তু কোন সাড়া না পাওয়াতে প্রকাশনের ভার নিজেই নিলাম এবং বইটিকে কিছুটা ঢেলে সাজালাম – কিছু গ্রহণ ও বর্জন করে।

বিষয় বস্তুটি—

"বিষয়বস্তু বড়ই কঠোর বড়ই নিঠুর
চেষ্টা করেছি করিতে সরল করিতে মধুর,
যা ছিল অজানা যাহা ছিল দূর
করেছি চেষ্টা আনিতে হৃদয়পুর।"

যাদের জন্য চেষ্টা করেছি সেই ছাত্র ছাত্রীরা যদি কিছু উপকৃত হয়— সেটাই হবে পুরস্কার।

তিরস্কার কিছু না কিছু জুটবে। তা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটেছিল— এখনো তার বিরাম নেই। অতএব আমি মাভৈ। তবে যাঁরা তিরস্কার করবেন তাঁদের কাছে আমার নিবেদন—রচনা যা পাইনি তার বিচার না করে, যা পেয়েছি তার বিচার। কবি সমালোচক এ্যাবারক্রম্বে বলেছেন—"Every composition contains within it self the rules by which it should be criticised."

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁদের রচনা থেকে সাহায্য পেয়েছি—তাঁদের নাম ও গ্রন্থনাম "নির্ঘণ্টে" শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছি।

চাঁদের কলঙ্কের মতই কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে "শুদ্ধিপত্র" দিয়ে পাঠক-পঠিকাদের কষ্ট দিতে চাইনে।

ইতি—

ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তী

১/১/৫৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছন্দ

'ছন্‌দ' শব্দটির মধ্যে রয়েছে—একটি সুরের ঝংকার বা সুরের স্পন্দন।

ভাবের বাহন—ভাষা। এর প্রকাশ ভংগি দুটো—গদ্য আর পদ্য। দুটোর মধ্যে ছন্দ থাকলেও রয়েছে—বিরাট পার্থক্য। এবং এই পার্থক্য—আকৃতি ও প্রকৃতিতে।

আমরা কথা গুলোকে কোন তির্যক ভংগি না দিয়ে যখন সোজাসুজি বলি, তখন আমরা বক্তব্য-বিষয়কে সহজেই বুঝি এবং জানতে পারি—কিন্তু এ বোঝা ও জানা—কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে না এবং আকুল করে না মনপ্রাণ। যেমন: "আকাশে মেঘ গর্জন করিতেছে। বর্ষা চাপিয়া আসিয়াছে। কূলে একা বসিয়া আছি, কোন ভরসা নাই"। এ হচ্ছে নিছক গদ্য। যতি বা বিরাম চিহ্ন দিয়েও এর ভেতর প্রাণের নিবিড় স্পন্দনটুকু অনুভব করতে পারা যাচ্ছিল না; কিন্তু কবি যখন ভাষাকে তির্যক ভংগি দিয়ে বললেন—

"গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা"

তখুনি অন্তরে জেগে উঠল—স্পন্দন, বইয়ে দিলে সুরের হিল্লোল, দেখা দিল অনির্বচনীয়তা—এটাই হ'ল পদ্য, এখানেই পেলাম তার ছন্দ মাধুর্য।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। সেতারে তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার বাঁধা সেতার, কথার সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে।"

ছন্দ-বদ্ধ বাক্যই কাব্য। এবং সে বাক্য হবে রসাত্মক বাক্য। পদ্য সম্বন্ধে জনসন্‌ বলেছেন—"Poetry, says Johnson, is Netrical Composition. ম্যাকলে (Macaulay) বলেছেন—"We mean the art of employing words in such a manner as to produce illusion on the imagination" একেই কার্লাইন বলেছেন—"Musical thought" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"অন্তর হতে আহরিবচন
আনন্দ লোক করি বিরচন
গীতরস ধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।"

এই "গীতরসধারা"র মধ্যে যে অনির্বচনীয়তাটুকু রয়েছে—তারই মাঝে রয়েছে—ছন্দ।

ছন্দের জন্ম

ছন্দের জন্মের ইতিহাসে পাই—বাল্মীকি ধ্যানমগ্ন, হঠাৎ একটা করুণ আর্তনাদে তাঁর ধ্যান ভংগ হ'ল। তিনি তাকিয়ে দেখলেন মিথুনরত দুটো পারাবত-পারাবতীর মধ্যে একটিকে এক ব্যাধ হত্যা করেছে। পারাবতীর করুণ আর্তনাদ ধ্যানমগ্ন ঋষির অন্তরকে মথিত করল। সেই দ্রবীভূত করুণাধারা নির্ঝরিণীর মতই বেরিয়ে এলো—কবির মুখ দিয়ে, উচ্চারিত হ'ল—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্"

এ বাণী উচ্চারিত হওয়ার পরই ঋষি কবির চিন্তা হ'ল—

"তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব চাদ বীক্ষতঃ
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া"

বীক্ষণশীল মুনির অন্তরে জাগল, শকুনির শোকে শোকার্ত হয়ে যা আমি উচ্চারণ করলাম—এ কী? তখন নিজের প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে তিনি এর প্রকৃতি চিন্তা করতে লাগলেন—

"চিন্তয়ন্ স প্রজ্ঞাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিম্"

তারপর তিনি শিষ্যদের বললেন—

"পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা"

"এই বাক্য পদবন্ধ, এর প্রতিপদে সমাক্ষর, ছন্দের তন্ত্রীলয়ে এ আন্দোলিত; আমি শোকার্ত হয়ে একে উচ্চারণ করেছি, এর নাম শ্লোক হোক।" এই হল ছন্দের ইতিহাস।

এই "পদবাক্য"কে অবলম্বন করে সুরু হল বিভিন্ন জিজ্ঞাসার। বিভিন্ন আলংকারিকেরা সুরু করলেন এই 'পদবন্ধ' বাক্যের বিচার করতে। সেই বিচার দুটো ধারায় বিভক্ত—'ছন্দঃ শাস্ত্র' ও 'অলংকার শাস্ত্র'। অলংকার শাস্ত্রে বিশ্লেষিত হল—

'রীতি, অলংকার বক্রোক্তি, রস, ধ্বনি'।

ভাষা ও ছন্দ

ভারতীয়-আর্য ভাষা তিনটি স্তরে বিভক্ত—(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষা (বৈদিক সংস্কৃত)। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ পর্যন্ত। (খ) মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষা (অশোক ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ) (অবহট্ঠ, অপভ্রষ্ট)। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দ থেকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দ পর্যন্ত। (গ) নব্য-ভারতীয় আর্য-ভাষা (বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, উড়িয়া প্রভৃতি)। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত।

ছন্দ-বিচারেও তিনটি স্তর লক্ষ্যণীয়—

(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় পাই—অক্ষর মূলক ছন্দঃ পদ্ধতি

(খ) মাত্রা মূলক ছন্দঃ পদ্ধতি

(গ) নব্য-ভারতীয়-আর্য ছন্দের পদ্ধতি হচ্ছে—

অক্ষর মূলক, মাত্রামূলক এবং এদের সংগে রয়েছে অপভ্রংশে রচিত গান-কবিতা-ছড়ার ছন্দ।

সংস্কৃত ছন্দ দু'জাতের—বৃত্তচ্ছন্দ ও জাতিচ্ছন্দ।

"পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা
বৃত্তমক্ষর সংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥"

ছন্দোমঞ্জরী ১/৪

অক্ষর বা বর্ণের সংখ্যা গুণে যে ছন্দ তাকে বলা হয় "বৃত্ত" এবং মাত্রায় সংখ্যা দ্বারা যে ছন্দ প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় জাতি।"

বৈদিক ও সংস্কৃত ছন্দ

বৈদিক (আদি ভারতীয়-আর্য ভাষা) ছন্দের নীতি ছিল অক্ষরমাত্রিক। অর্থাৎ প্রধানত চরণে অক্ষরের নির্দিষ্ট সংখ্যার ওপর ছন্দের রূপ নির্ভর করত। তবে সেই অক্ষরের গুরুলঘুক্রমেরও নিয়ম ছিল। বৈদিক ছন্দে ছত্রের শেষ পর্ব ছাড়া অন্যত্র অক্ষরের লঘু-গুরুক্রমন্যাসে বেশ স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সব পর্বেই অক্ষরের লঘু-গুরুক্রম ছিল অনতি-ক্রমনীয়।

বৈদিক ছন্দ চারটি—ত্রিষ্টুভ্, গায়ত্রী, জগতি ও অনুষ্টুভ্। অবেস্তা ও প্রাচীন ইরানীয় ভাষায়ও আছে।

পালি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দ

পালি সাহিত্যে ছন্দ মোটামুটি সংস্কৃতের মতো, অর্থাৎ অক্ষরমূলক এবং

ক্বচিৎ মাত্রামূলক।

প্রাকৃতে আর্য ছন্দ 'গাথা' (গাহা) নামে পরিচিত। এইটিই প্রাকৃতের বিশিষ্ট ছন্দ। একমাত্র ছন্দ বললেও ভুল বলা হ'ল বলে মনে করা চলে না।

প্রাকৃতে ছন্দের যে দৈন্যতা দেখি অপভ্রংশে সে দৈন্যতা নেই। চরণের শেষে মিল এবং সমমাত্রিকতা থাকায় অপভ্রংশ শ্রুতিমাধুর্যে সংস্কৃতের অতিশায়ী বলা যেতে পারে। সাহিত্যিক অপভ্রংশ মুখের ভাষার অত্যন্ত কাছাকাছি এবং তার ছন্দ লৌকিক ছড়াগানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তার মধ্যে কথ্য ভাষার প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হয়।

গাহা ও দোহা ছাড়া প্রায় সমস্ত অপভ্রংশ ছন্দই চতুষ্পদ, এবং প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্থ পাদে মিল, অর্থাৎ দুটো দ্বিপদের সমষ্টি, যেমন—

"সংপত্তবি-/সুরণও
তুরিঅংপর-/বারণও।
পিঅঅম দংসণ- লালসও
গঅবরু বিমুহিত-/মাণসও"

(চার পাদ, প্রতিপাদে ১২ মাত্রা, ছয়-মাত্রার পর যতি। "জগতী")

জয়দেব

মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, এক-একটা যুগকে প্রভাব্বিত করেছে কোনো কোনো মহাপুরুষ; আবার দেখতে পাই কিছু সংখ্যক মহৎ লেখকের লেখাই যুগকে প্রভাবান্বিত করে জাগরণ এনেছে।

যীশুর আবির্ভাবের আগে যেমন জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট এসে তাঁর আক্রমণের পথকে তৈরী করেছেন, চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাবের আগে এসেছেন অদ্বৈত আচার্য, ঠিক তেমনি এক একটা যুগান্তরকারী আন্দোলনের আগে এসেছে এক-একখানা বই—ফরাসী বিপ্লবের আগে এসেছেন ভল্‌টেয়ার, রুশ-বিপ্লবের আগে পাই—গোগল থেকে সুরু করে গর্কী পর্যন্ত সাহিত্যিকদের অবিরাম সাহিত্য সাধনা, বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে—আনন্দ মঠের তথা "বন্দেমাতরম" মন্ত্রের প্রভাবে। ঠিক তেমনি আবির্ভূত হয়েছেন—কবি জয়দেব।

বাংলা সাহিত্যের এবং গুজরাটী সাহিত্যের আদি গুরু হিসেবে যদি কারুর বন্দনা করতে হয়—তবে করতে হবে কবি জয়দেব এবং তাঁর গীতগোবিন্দকে।

যে-নদীয়ায় আবির্ভূত হন চৈতন্যদেব, সেই নদীয়ার গঙ্গার ঘাটে বসত সুরাপায়ীদের আসর, বসত বারবণিতাদের উৎসব-সভা। যৌন-বিকার ও ইন্দ্রিয়-আসক্তির

নির্লজ্জ প্রসারে ডুবে যেতে বসেছিল বাঙালীর জাতীয় চেতনা। সেই সময়ে কেন্দুবিল্বে আবির্ভূত হন কবি জয়দেব। তিনি রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক আদিরসাত্মক ছুট্কো পদগুলির একটি বিশিষ্ট রূপদান করলেন তাঁর 'গীতগোবিন্দে'। তিনি তাঁর গীতগোবিন্দে নিয়ে এলেন প্রেমের পাবক বাণী, বিকৃত মানবজীবনের সামনে তুলে ধরলেন—সঞ্জীবনী সুধা। তিনি তাঁর গীতগোবিন্দে তুলে ধরলেন না কোনো তত্ত্বকথা, নীতি বা উপদেশ। নরনারী যে-পিপাসায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজেরাই বিষপাত্র গ্রহণ করে সে পিপাসা মানব জীবনে সত্য। সেই পিপাসার তৃপ্তি হতে পারে রসের আস্বাদনে। জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের রসধারায় জাতিকে স্নাত করিয়ে তৃষ্ণা-বিভ্রান্ত চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে গেলেন।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ একাধারে—কাব্যের রসঘন মূর্তি, প্রেম-জীবনের ধাত্রী অপর দিকে বাংলা ছন্দের আদি পুরুষ। তাঁকে অনুসরণ করলেন কাব্য রচনায়, ছন্দ-নির্মাণে বৈষ্ণব পদকর্তারা। শুধু তাই নয় সেই ছন্দের নির্ঝরিণী রবীন্দ্রনাথকেও অনুপ্রাণিত করেছে—বিশেষ ভাবে।

গীতগোবিন্দের ভাষা—সংস্কৃত, ভাব বাংলা, ছন্দ—অপভ্রংশ অনুসৃত।

প্রাকৃত যুগেই মাত্রাছন্দের প্রচলন সুরু হয়; অপভ্রংশে এর কাঠামোর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। চর্যার পদ কর্তারা পদ রচনায় এই ছন্দ-রীতি অনুসরণ করেছেন। তবে এটাও ঠিক যে চর্যার ছন্দ বাংলা মাত্রা ছন্দ এবং অপভ্রংশের মতো পঙ্‌ক্তি নির্ভর নয়, এর পর্ব-বিভাগ সুস্পষ্ট।

গীতগোবিন্দের পদগুলো অপভ্রংশ ছন্দে রচিত। তবে এর পদগুলোতে ধ্বনি সৌন্দর্য রয়েছে। ব্রজবুলির ছন্দ মৈথিল-পদাবলীর ছন্দের অনুকরণে রচিত। উমাপতি ও বিদ্যাপতির ছন্দ অপভ্রংশ থেকে নেওয়া। তথাপি মৈথিলী ও ব্রজবুলির ওপর জয়দেবের প্রভাব গুরুত্ব। এই ছন্দের স্বরূপটি চিনতে হলে কিছুটা তার মাত্রার ওপর নির্ভর করতে হয়। গীতগোবিন্দের চব্বিশটি গানের ২২টি গান মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এই কাব্যে 'সমপঙ্‌ক্তিক' এবং "অসম পঙ্‌ক্তিক গঠন রীতি রয়েছে—

৪ ৪ ৪ ৩

অনিল ত / রল কুব / লয় নয় / নে-ন। ৪ / ৪/ ৪ / ৩=১৫
তপতি ন / সাকিশ / লয় শয / নে-ন ॥ ঐ

৪ ৪ ৪ ৪

১৬ মাত্রার ঃ পশ্যতি / দিশি দিশি রহসি ভ / বন্তম্ =১৬

৪ ৪ ৪ ৪

স্মরসম / রো-চিত / বিরচিত / বে-শা-।

৪ ৪ ৪

গলিত কু / সুম দর / বিলুলিত / কে-শা-।

এখানে শেষ পঙ্‌ক্তি—গুরু ; কোনোটি স্বরান্ত দীর্ঘ, কোনোটি হলন্ত। শেষ পঙ্‌ক্তি গুরু ধরাতে ১৫ মাত্রার স্থলে ১৬ মাত্রা হয়েছে। "ছন্দোমঞ্জরী"তে বলা হয়েছে—

"সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা ॥" ১/১১

ব্রজবুলিতে আমরা তিন মাত্রা, চার মাত্রা, পাঁচ ও সাত মাত্রার পদ পাই। এটা জয়দেবের প্রভাব জনিত।

চার মাত্রা :

মুহুবর / লোকিত- / মণ্ডল- / লী-লা-।
মধুরিপু / রহমিতি / ভবন- / শী-লা-।

পাঁচ মাত্রা :

১১১ ১১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১১ ১ ১ ২ ১ ২
"কথিত সম / য়ে-ঽপি হরি / রহহ ন য / যৌ-বনম্
মম বিফল / মিদমমল // মপি রূ-প যৌবনম্"

ঐ :

বদসি যদি / কিঞ্চিদপি / দন্তরুচি / কৌমুদী
হরতিদর / তিমিরতি / ঘোরম্।
স্ফুরধর / সীধরে / তব বদন / চন্দ্রমা-।
রোচয়তি / লোচন-চ- / কোরম্।

তুঃ ভানুসিংহ (রবীন্দ্রনাথ)

"গ্রাম্যকুল / বা-লিকা / সহজে পশু / পা-লিকা-
হাসকিয়ে / শ্যামউপ / ভো-গ্যা
রাজকুল / সম্ভব / সুরমিরহ / গৌরবা।
যোগ্যজনে / মিলয়েজনু / যোগ্যা"

ভানু সিংহ :

৪ ৪ ৪ ৪
সতিমির / রজনী- / সচকিত / সজনী-। —৮

২১১ ১২১ ১২১
শূন্য- / নিকুঞ্জ / অরণ্য। —১২
৪ ৪ ৪

"মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করতে গিয়ে জয়দেব অনুভব করেছিলেন যে সংস্কৃত ব্যাকরণকে অনুসরণ করে কাব্য রচনা করতে গেলে বর্ণের হ্রস্বদীর্ঘকে যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। অথচ কবির কানে সর্বদাই ধ্বনিত হচ্ছে—অপভ্রংশের ছন্দ। যেখানে মাত্রা নিরূপণ করার পদ্ধতি হচ্ছে—

"লঘুগুরু এক্ক ণিঅম ণহি জেহা।"

তাই জয়দেব ছন্দ নির্মাণে প্রাকৃত-অপভ্রংশের নিয়মের পথ ধরেই চলেছেন। 'অক্ষরবৃত্তে' তিনি সংস্কৃত রীতিকে অনুসরণ করলেও 'মাত্রাবৃত্তের' ক্ষেত্রে প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতিকে অনুসরণ করেছেন। তাই গীতগোবিন্দের পদগুলো বহুলাংশে গুরু-গম্ভীর হলেও, গানগুলো সত্যই "মধুরকোমলকান্ত" হয়ে পড়েছে।

চর্যার ছন্দ

অর্বাচীন অপভ্রংশের অর্থাৎ লৌকিকের বিশিষ্টতম ছন্দ ছিল "চতুষ্পদী", যার সগোত্র "পাদাকুলক" প্রভৃতি। "ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক ছন্দটি "লঘুগুরুর" বেড়াজাল থেকে নিজেকে অনেকটা মুক্ত করতে পেরেছিল বলে ছন্দোনির্মাণে একচ্ছত্র হতে পেরেছিল। "প্রাকৃত পৈঙ্গলে" বলা হয়েছে—

"লহুগুরু এক্ক ণি-অম ণহি জেহা
পঅ পঅ লেক্খহি উত্তম রেহা।
সুকই-ফণিন্দহ কণ্ঠহ বলঅং
সোলহমত্তা পাআকুলঅং"

সংস্কৃত "পজ্ঝটিকা" অপভ্রংশে পাদাকুলকে পরিণত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন 'পাদাকুলক' এর ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—'পজ্ঝটিকা' (পদ্ধতিকা) ও পাদাকুলক (=পদ সমষ্টি)। তিনি আরও বলেছেন "পয়ার" শব্দটির ছন্দ-নাম রূপে ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দের আগে ঘটে নাই। ইহা 'পদ' শব্দ হইতে উৎপন্ন নহে। ইহার আসল মানে "তরল প্রবাহ", ছন্দে "বর্ণনাময় ঢালা আবৃত্তি"। সুরে গীত হইলে বলা হইত নাচাড়ী (* নৃত্যপাটিক)। পরে নাচাড়ীর নামান্তর 'ত্রিপদী' চলিত হইয়া গেলে পয়ারের আধুনিক অর্থ আসিয়াছে"

ভাষার ইতিবৃত্ত। পৃঃ ৩৮১ (ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৯৭৯)।

বাংলা পয়ারের জন্ম হয়েছে—'চতুষ্পদী' থেকে। চর্যার পদগুলোর বেশির ভাগই এ ছন্দে রচিত। চতুষ্পদী ('চউপঈ', অপভ্রংশে) 'অতিশক্করী'র মতো ছন্দ; এর মাত্রা সংখ্যা ১৫। এর থেকেই ১৪ মাত্রার পয়ারের জন্ম। (১ মাত্রা 'যতি' শোষণ করে নিয়েছে)। যেমন—

৮

"নিতি নিতি সিআলা- / সিহে সম জুঝই
ঢেণ্টণ-পাত্রর গীত / বিরলে বুঝই"।

এই ৮+৭=১৫ পরে ৮+৬=১৪ হয়ে পয়ারে পরিণত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেন ১৪ মাত্রার শক্করী জাতীয়, চতুর্দশ-মাত্রিক (৮+৬), প্রথম মাত্রা সাধারণত প্লুত। যেমন—

"হউ যুবতী / পাতিয়ে হীন
গঙ্গা সিনাইবাক / জাইয়ে দিন।"

বাংলা ত্রিপদীর প্রাচীনতম রূপও চর্যাতে পাই—

৮ ৮
"কিন্তো- / মন্তে- কিন্তো- / তন্তে
কন্তোরে / ঝা-ণর / খা-নে-। ১২

তুলনীয় জয়দেবে—

"রতি সুখসারে- গতমভি সা-রে-
মদ-নম / নো-হর / বে-শম্। (৮+৮+১২)

বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলা বৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে।"

আধুনিক বাংলা ছন্দের কথা বলার আগে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বৈষ্ণব পদাবলী থেকে কিছু পদ উদ্ধৃত করা হ'ল।

বৈষ্ণব পদাবলীর দুটো ধারা—ব্রজবুলী এবং বাংলা ভাষায় রচিত। ছন্দের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বাংলা ছন্দের দুটো রূপের প্রাচীন রূপ রয়েছে। এবং সামান্য কিছু পদে পাই চলতি ভাষার ছন্দ যার ভাষা হল 'অসাধু'।

বাংলা কাব্যের মূল ছন্দ হচ্ছে—তান প্রধান ও ধ্বনি প্রধান তারপর সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করল অসাধু ভাষার ছন্দ—ছড়ার ছন্দ।

ছন্দের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীতে দুটো রীতি বিশেষ প্রচলিত— (১) মাত্রাবৃত্ত (২) অক্ষরবৃত্ত কয়েকজন পদকর্তা ছড়ার ছন্দেও কিছু পদ রচনা করেছেন।

অক্ষরবৃত্তের প্রধান ও আদি পদকর্তা হচ্ছেন—বড়ুচণ্ডীদাস। তিনি তাঁর "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" কাব্যটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচনা করেছেন এই গ্রন্থের প্রধান—হল পয়ার ছন্দ এবং পয়ারের রূপটি যথাসম্ভব বজায় আছে। গান করার জন্য পদগুলো রচিত

হওয়ায় স্বরধ্বনির উচ্চারণ পুরোপুরি একমাত্রিক নয় এবং প্রয়োজন বোধে দীর্ঘস্বর টেনে পড়তে হয়—

অাসাঢ় (=আঅসাঢ়) মাসে নব / মেঘ গরজএ ৪+৬
মদন কদনে মোর / নয়ন সুরএ ॥ ৪+৬

তবে মাঝে মাঝে ১৪ অক্ষরের বেশিও দেখতে পাওয়া যায়—

১০ ৬
ফুটিল কদম ফুল ভরে / নোঁআইল ডাল
এভোঁ গোকুলক নাইল / বাল গোপাল

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে চার ছাঁদের 'ত্রিপদী'ও দেখতে পাই—

(১) ৬+৬+৮ (২) ৮+৮+১৭ (৩) ৮+৮+১৪ (৪) ৮+৮+৮

৬ ৬
(১) কথাঁ না বসাস / কথাঁ তোর ঘর।
৮
যাইবে কোমণ দেশে

মাত্রা গণনায় উচ্চারণ পদ্ধতি সব সময় রক্ষিত হয়নি, ব্যতিক্রম দেখতে পাই। এগার অক্ষরে, দশ অক্ষরের ছন্দ আছে—

"বুলিতে নারএ / তোর চরিতে ৬+৫=একাবলী

দশ অক্ষরের ছন্দ—

কুশলে কি / আছহ নাতিনি। ৪+৬=১০

দ্বিপদ ও ত্রিপদ মিশ্র ছন্দও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়— প্রথম ছত্র পয়ার, দ্বিতীয় ছত্র দশাক্ষর (৬+৪)—

"হার কেয়র রাধা / সব মোর নে। ৮+৬
বাঁশীগুটি / আনী মোক দে।" ৪+৬

মধ্য যুগের বাংলা ছন্দ

মধ্যযুগে বাংলা ছন্দের অক্ষরের মাত্রাসম উচ্চারণ রীতি ক্রমশ হ্রস্ব দীর্ঘস্বর সমান হয়ে গেল, ফলে ত্রিপদীর লালিত্য ও প্রবহমানতা বেড়ে গেল। পদান্ত অ-কারের লোপের ও শ্বাসাঘাতের স্পষ্টতার জন্য 'ত্র্যক্ষর' শব্দ দ্ব্যক্ষরে (disyllabi) পরিণত হয়। ফলে দুদিক থেকে ছন্দে শক্তি দেখা দেয়। প্রথম চরণার্ধে অক্ষরবহ ক্ষমতা বেড়ে গেল—পয়ার ছত্র ষোল-সতের অক্ষর স্থান দখল করতে সুরু করে এবং এর ফলে

গদ্যের কাজ চালানর পক্ষেও পয়ার আরও বেশি উপযোগী হ'ল বাংলা ছন্দ তখনো সুরপ্রধান ছিল, ফলে অক্ষরবৃদ্ধি কানে বাজত না—

অনন্ত কামধেনু যাহাঁ / চরে বনে বনে
দুগ্ধমাত্র দেন কেহ না / মাগে অন্য ধনে ॥

ত্রিপদীর বেষ্টনীতে ছড়ায় নৃত্যচপলতা বাঁধা পড়ল। লোচনদাসের "ধামালী" পদাবলীতে—

জ্বালার্ উপর্ / জ্বালা সই // জ্বালার্ উপর্ / জ্বালা
জল্‌কে যাই / পথ্ না পাই // বসন্ টানে / কালা

জ্ঞান দাসের—

নন্দের্ বাড়ী / তমাল্ গাছে // কন্‌ক্‌লতা / বেড়ি।
কালা দেহ / পীত বসন্ // নীল্ বসনে / গোরী ॥

ডঃ সুকুমার সেন এই ধামাবলীর সঙ্গে তুলনীয় লৌকিক "নিশিপাল" ছন্দের উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়েছেন—

গিরি টরই / মহি পড়ই / নাগমন / কম্পি আ
তরণি-রথ / গগন-পথ / ধূলি ভরে / ঝম্পি আ ॥

ব্রজবুলি

সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর ধ্বনি দু'মাত্রার ছিল, অপভ্রংশে তা ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এসেছে এবং মৈথিল পদগুলোতে দীর্ঘস্বরকে দু'মাত্রার আসন দেওয়া হয়নি বললেই চলে। বিশেষ করে গানের মধ্যে সুরের তালই এনেছে এই সংকোচন রূপটি। সংবৃত শব্দকে দুভাবে গানের মধ্যে ধরা হয়েছে—অর্থাৎ প্রয়োজনানুসারে কখনো 'দীর্ঘ' আবার কখনো 'হ্রস্ব' করে ধরা হয়েছে—

„প্রাকৃত পৈঙ্গল" এ হ্রস্বস্বরান্ত ও দীর্ঘস্বরান্ত Closed এবং Open Syllable কে যে ভাবে ধরা হয়েছে বিদ্যাপতি মূলতঃ সে-পন্থাই অনুসরণ করেছেন—

"দীহ সংযুক্তপরো, বিন্দুজুও পাডিও অ চরণংতে।
সগুরু বংক দমত্তো, অন্নো লহু হোই সুদ্ধ এক্কঅলো ॥"

অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব অক্ষর, বিন্দুযুক্ত অক্ষর, চরণের শেষ অক্ষর দীর্ঘ।

আবার কখনো কখনো সংযুক্তপূর্ব অক্ষর লঘু হয়ে পড়েছে। সানুস্বর, ই-কার, হি-কার, ঋ, এ-কার, ও-কার, রেফ্ পূর্ব বর্ণে থাকলে অনেক সময় গুরু আবার অনেক সময় লঘু হিসেবে ধরা হয়েছে।

"প্রাকৃত-পৈঙ্গল" এর সূত্রগুলো বিচার করলে দেখা যায় যে প্রাকৃত অপভ্রংশ যুগ থেকে ছন্দ রচনার ক্ষেত্রে হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্বর বা সংযুক্তব্যঞ্জন প্রভৃতি কোনো ধ্বনিই আর সংস্কৃতের মতো শুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। বিদ্যাপতি এবং তাঁর পরবর্তী কবিদের রচিত পদের ছন্দ বিশ্লেষণ করলে এই শৈথিল্য দেখতে পাওয়া যাবে।

১১ মাত্রার পদ :-

জহাঁ জহাঁ / পদজুগ / ধরঈ 4 / 4 / ৩
তহিঁ তহিঁ / সরোরুহ / ভরঈ ঐ
জহাঁ জহাঁ / ঝলকত / অঙ্গ— ঐ
তহিঁ তহিঁ / বিজুরিত / রঙ্গ— (মাত্রাবৃত্ত)

চতুর্মাত্রক ত্রিপার্বিক :-

জলউ জ : লধি জল / মন্দা—
জহা বসে / দা-রুণ / চন্দা—
বচন ন : হি কে পর / মা-নে— ॥ ৪ / ৪ / ৪ (মাত্রাবৃত্ত)

ষন্মাত্রক দ্বিপার্বিক :-

বচন কহবি / কাঁদন মা-খি। ৬ / ৬
মা-ন করবি / আদর রা-খি।
জব করে ধরি / নিকট আ-নি।
উহু উহু কএ / কহবি বা-নি ॥ (মাত্রাবৃত্ত)

১৪ মাত্রার (৪+৪+৪+২)
সুন্দরি / চল লিহু / পহু ঘর / না—। ৪ / ৪ / ৪ / ২
চহুঁদিস / সখি সব / কর ধর / না।

২ ১ ১ ১ ১১১ ১১১১
(যব) গোধুলি সময় / বে-লি- (২) ৬ / ৪
(ধনি) মন্দির বাহির / ভে-লি- ঐ
নবজলধর / বিজুরি রে-হা ৬ / ৬
দন্দপসারি / গে-লি- ৬ / ৪ (মাত্রাবৃত্ত)

যব — অতি পর্ব ; বেলি — অপূর্ণ পর্ব।

ত্রিপদী :

আ-জ দেখি এ সখি বড় অনুমনি সনি
বদন মলিন মুখ তো-রা- ৮ / ৮ / ১২
(জয়দেবের— "চন্দন চর্চিত নীল কলেবর
পীত বসন বনমালী" অনুকরণে রচিত)

জ্ঞান দাস :

শুন শুন / নিরদয় / কা-নু ৪ / ৪ / ৩
তহুঁ অতি / হৃদয় পা : ষা-ণ ॥

গোবিন্দ দাস :

শারদ চন্দ / পবন মন্দ ৬ / ৬
বিপিনে ভরল / কুসুম গন্ধ ৬ / ৬
ফুল্ল মল্লি / মালতি যূথি ৬ / ৬
মত্তমধুপ / ভোরণী ৬ / ৫ (মাত্রাবৃত্ত)

তুঃ রবীন্দ্রনাথ :

গহন কুসুম / কুঞ্জ মাঝে ৬ / ৬
মৃদুল মধুর / বংশী বাজে ৬ / ৬
বিসরি ত্রাস / লোক লাজে ৬ / ৬
সজনি আও / আও লো ॥ ৬ / ৫ (মাত্রাবৃত্ত)

রায় শেখর :

কি পেখনুঁ / গৌর কি : শোর। ৪ / ৪ / ৩
সুরধনি / তী- রেউ : জোর "
সু ঘর ভ : কতগণ / সঙ্গ ঐ
করতহিঁ / কত কত / রঙ্গ ঐ (মাত্রাবৃত্ত)

বলরাম দাস :

জিনি মদ / কুঞ্জর // গতি অতি / মন্থর। ৪ / ৪ / ৪ / ৪
অধর সু : ধা-রস // মধুর হ : সিত ঝর ॥ ঐ (মাত্রাবৃত্ত)

(লঘু ত্রিপদী)

সদাই ধিয়ানে / চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা। ৬ / ৬ / ৮

৮ অক্ষরবৃত্ত।

না জানি কতেক মধু
শ্যাম নামে আছে গো ৮
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। ১০

৮+৮+১০ (দীর্ঘ ত্রিপদী) অক্ষরবৃত্ত।

১১ মাত্রা ঃ

না বান্ধে চিকর / না পরে চীর। ৬ / ৫
না খাএ আহার / না পিএ নীর ॥ ৬ / ৫

৮+৬=১৪ (পয়ার—লঘু)

তোমারে বুঝাই বন্ধু / তোমারে বুঝাই। ৮+৬
ডাকিয়া সোধায় মোরে / হেন জন নাই ॥ ৮+৬

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ ঃ (স্বরবৃত্ত)

মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ, জ্ঞান দাস, লোচন দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি পদকর্তারা বাংলার লৌকিক ছন্দে কিছু পদ রচনা করেছেন—

মুরারি গুপ্ত ঃ

রাধার ভাবে / আকুল প্রাণ / গোকুল পড়ে / মনে
৪টি পর্ব ; একটি অপূর্ণ পর্ব, শ্বাসাঘাত অনুভূত হয়।

বাসু ঘোষের—

দিগ বিদিগ / নাহি গোরার / না চিনে নিজ / পর
ঘুমে পাড়ি / কাঁদে নিতাই / ভাইয়া ভাইয়া/ বলি।
শ্বাসাঘাত অনুভূত হয়।

গোবিন্দ দাস ঃ

তোরে নিষেধ / করি বাঁশী // তোরে নিষেধ / করি।

রায় শেখর ঃ

ঠাম ঠমকা / কাঁকান বাঁকা / মধুর মাখা / হাসি
বিশচন্দ্রে / কেলি করে / করপদে / আসি

৪ /৪ / ৪ / ২=১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ছন্দের সূতিকাগার থেকে আরম্ভ করে কৈশোর পর্যন্ত আলোচনা করেছি। এবারে বয়ঃসন্ধির আলোচনা করে ছন্দের লালিত্যময় যৌবনের কথায় আসব। তবে তার আগে অক্ষর, পর্ব, যতি ইত্যাদির শ্রেণী ভাগ করে ঊনবিংশ শতাব্দের ছন্দের ইতিহাসে যে নোতুনত্ব মধুসূদন এনেছিলেন তার আলোচনা করে পরবর্তী কালের ছন্দের আলোচনা করব।

বাংলা ছন্দের প্রকার ভেদ

"বৃত্তচ্ছন্দ" ও "জাতিচ্ছন্দ" হল সংস্কৃত ছন্দ। বৃত্তচ্ছন্দে অক্ষর সংখ্যা এবং "জাতিচ্ছন্দে" মাত্রা সংখ্যা দিয়ে এই দুটো ছন্দের স্বরূপ এবং পার্থক্য নির্দেশ করা হয়ে থাকে। বৃত্তচ্ছন্দ এবং জাতিচ্ছন্দ পরবর্তীকালে "অক্ষরবৃত্ত ছন্দ" এবং "মাত্রাবৃত্ত ছন্দ" নামে পরিচিত হয়েছে।

সংস্কৃত—তোটক, তূণক, রুচিরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দ হচ্ছে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং পজ্ঝটিকা, আর্যা প্রভৃতি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গঠিত, বাংলাতেও ঐ দু'ধরণের ছন্দ রয়েছে। উপরন্তু অপভ্রংশের একটি ছন্দ বাংলাতে দেখতে পাওয়া যায় (নিশিপাল)—সেটাই হয়েছে স্বরবৃত্ত ছন্দ।

বিভিন্ন ছান্দসিক এই তিন প্রকার ছন্দের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন।

অক্ষরবৃত্ত : এই নামটি দিয়েছেন—ছান্দসিক প্রবোধ চন্দ্র সেন। হালে, তিনি ঐ ছন্দের নোতুন নামকরণ করেছেন— **মিশ্রকলাবৃত্ত**-রীতি (mixed moric style) ; রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন—'সাধু বাংলার ছন্দ' ; অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় নাম দিয়েছেন—'তান প্রধান ছন্দ'। ডঃ সুকুমার সেন, তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (৩৮৬ পৃঃ) একে বলেছেন 'প্রবীণ তদ্ভব ছন্দ'।

তিনি শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ সম্বন্ধে ভাষার ইতিবৃত্তে (পৃঃ ৩৮৬) বলেছেন—"ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে রাঢ়ীতে পদে আদি স্বরাঘাত ও অন্ত্য অ-কার লোপ প্রতিষ্ঠিত হইলে পরে ঝোঁক-দেওয়া চপল ছড়ার-ছন্দ ত্রিপদীর দলে স্থান পাইল।

তবে এ ছন্দের মেয়েলি সুর ও খেয়ালি চাল বৈষ্ণব-কবি সমাজের বাহিরে শিষ্টরচনায় সমাদর পায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত এই ধরণের ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন প্রধানত হাস্যরস সৃষ্টির কাজেই। পরে শতাব্দের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ এই নাচনি ছন্দের সঙ্গে বুনিয়াদি তানপ্রধান ছন্দের কলম বাঁধিয়া দিলেন। তাহাই এখন "বল প্রধান" বা "শ্বাসাঘাত প্রধান" ছন্দ বলিয়া পরিচিত। ইহাকে দ্বিতীয় "নবীন তদ্ভব" ছন্দ বলা যায়। পয়ার-ত্রিপদীকে তানপ্রধান ছন্দ নাম দিলে এটিকে তালপ্রধান ছন্দ বলিব।"

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দটির নাম 'স্বরবৃত্ত' দিয়েছেন প্রবোধ চন্দ্র সেন। হালে আবার তিনি এর নাম দিয়েছেন—দলবৃত্ত।

মাত্রাবৃত্ত : এই নামটিও দিয়েছেন প্রবোধ চন্দ্র সেন, হালে, এর নোতুন নামকরণ করেছেন—কলাবৃত্ত। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন—সংস্কৃত ভাঙা ছন্দ। অমূল্যধন এর নাম দিয়েছেন—ধ্বনি প্রধান ছন্দ।

শিল্পীরা যখন শিল্পবস্তু তৈরী করতে সুরু করেন, তখন তাঁদের প্রয়োজন উপকরণের।

সাহিত্য কাব্য সৃষ্টি করতে গেলে দরকার অক্ষরের (syllable)।

অক্ষর : বাগযন্ত্রের সামান্য চেষ্টায় যে ধ্বনি সৃষ্ট হয় তাকে বলা হয়—অক্ষর। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে স্বরধ্বনি ছাড়া অক্ষর উচ্চারিত হতে পারে না। ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করতে হলে স্বরবর্ণের বা স্বরধ্বনির প্রয়োজন, ব্যঞ্জনযুক্ত না হলেও সব স্বরধ্বনিই অক্ষর। যেমন—অ, আ, ই, প্রভৃতি।

অক্ষর দু'ধরণের—স্বরান্ত ও হলন্ত। স্বরান্ত অক্ষর—বিবৃত (Open) এবং হলন্ত অক্ষর—সংবৃত (Closed)।

বিবৃত অক্ষরের প্রবোধ চন্দ্র হালে নামকরণ করেছেন—মুক্তদল। এবং সংবৃত অক্ষরের নাম দিয়েছেন—রুদ্ধদল।

ব'ল, শোনো, গেল প্রভৃতি অক্ষর স্বরান্ত। অর্থাৎ অন্ত্যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। এবং নাম্, দান, গান, জল্ প্রভৃতি অক্ষরের অন্ত্যে স্বরধ্বনি না থাকায় তাদের বলা হয়েছে 'হলন্ত' বা হসন্তমূলক অক্ষর।

বাংলা উচ্চারণ-রীতি সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতির মতো নয়। বাংলায় অক্ষয় হয় হ্রস্ব না হয়—দীর্ঘ। হ্রস্ব অক্ষর—এক মাত্রার এবং দীর্ঘ অক্ষর দু'মাত্রার কবিতা আবৃত্তিতে একটু মন ও কান পেতে রাখলেই ধরা পড়ে—কোন্ অক্ষর হ্রস্ব এবং কোন্ অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন— 'জননী'—একে বিশ্লেষণ করলে পাই—

জ+ন+নী ; আবার 'শরৎ' কে বিশ্লেষণ করলে পাই—শ+রৎ। তবে মনে রাখতে হবে যে হলন্ত অক্ষর যদি কোনো শব্দের শেষে থাকে তবে সাধারণতঃ সেগুলোকে 'দীর্ঘ' বলে ধরা হয়ে থাকে।

'সকালে সিনানে' এই পর্বটিতে রয়েছে ৬টি স্বরান্ত অক্ষর—সুতরাং এর মাত্রা সংখ্যা—৬। "শরৎ কালের" হলন্ত অক্ষর হলেও অন্ত্যাক্ষর হওয়ায় এরাও দীর্ঘ—শ+রৎ কা+লের হলেও মাত্রা সংখ্যায় এরাও—৬।

অক্ষরের মধ্যে—লঘু, গুরু, মৌলিক, যৌগিক, স্বভাব-মাত্রিক এবং প্রভাব-মাত্রিক অক্ষর রয়েছে।

লঘু অক্ষর ঃ যে অক্ষর উচ্চারণে বাগযন্ত্রের স্বল্প আয়াস প্রয়োজন—তাকে লঘু অক্ষর বলা হয়—মেলা, হেলা, খেলা, দোলা—প্রভৃতি।

গুরু অক্ষর ঃ যে অক্ষর উচ্চারণে বাগযন্ত্রের বেশি আয়াস্ দরকার—তাকে গুরু অক্ষর বলে—দক্ষিণ, গম্ভীর, অম্বর প্রভৃতি।

মৌলিক ঃ যে অক্ষরগুলোতে একটি ধ্বনি থাকে তাকে মৌলিক অক্ষর বলা হয়—আলো, কালো, ধরি, করি, সতী প্রভৃতি। এদের প্রতিটি অক্ষরে এক একটি ধ্বনি রয়েছে।

যৌগিক অক্ষর ঃ যে অক্ষরে একটির বেশি ধ্বনি থাকে তাকে যৌগিক অক্ষর বলে—ঐ, ঔ, অ+ই=ঐ ; অ+উ=ঔ। তবে যৌগিক অক্ষরে দু'টো ধ্বনি থাকলেও তারা থাকে হরিহরাত্মা হয়ে অর্থাৎ তারা পরস্পরে জড়িয়ে থাকে—এখানে বিচ্ছেদ নেই। হলন্ত অক্ষরকেও অনেক সময় যৌগিক অক্ষর হিসেবে ধরা হয়—রঙ্, সঙ্, হাত্, রাত্, কাত্ প্রভৃতি।

স্বভাব-মাত্রিক অক্ষর ঃ যে অক্ষর অনায়াসে এবং স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারণ করা হয়, তাকে স্বভাব-মাত্রিক অক্ষর বলা হয়—এসো, বসো, শোনো প্রভৃতি।

প্রভাব-মাত্রিক অক্ষর ঃ কোনো অক্ষর উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চারণ করতে হয় তাকে প্রভাব-মাত্রিক অক্ষর বলা হয়—যেমন—

"দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দ্রিত তব ভেরী"

এখানে 'দে' এর এ-কারের ওপর ; 'ভে' র এ-কারের ওপর ; এবং 'রী'র ঈ-কারের ওপর জোর বা Stress দিয়ে পড়া হয়।

যতি ও ছেদ ঃ (Metrical pause and sense pause) উচ্চারণ বিরতিকে ছেদ বা যতি বলে—কথা বলার সময় অথবা কোনো কবিতা পাঠ করার সময় একটানা উচ্চারণ না করে স্থান বিশেষে থেমে গিয়ে আবার পড়তে সুরু করি বা কথা বলতে সুরু করি। এই থামাটুকুর প্রয়োজন হচ্ছে অর্থদ্যোতনার জন্য। বাক্য বা বাক্যাংশের পর উচ্চারণের এই বিরতিকে "অর্থযতি" অথবা "ভাবযতি" (sense pause) বলা হয়। অর্থ প্রকাশের জন্যে ধ্বনি-প্রবাহের মধ্যে উচ্চারণ-বিরতির প্রয়োজন দেখা দেয়—

রাধার কি হৈল অন্তরে / ব্যথা
বসিয়া বিরলে / থাকয়ে একলে··· ···

'/' চিহ্নিত অংশে বিরতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ছেদ ঃ ছেদ দু'রকমের হতে পারে। কোনো চরণের যে অংশে প্রথম থামতে হয় তাকে উপচ্ছেদ বা অর্ধচ্ছেদ বলে। সাধারণতঃ বাক্যাংশের পর অল্পক্ষণের জন্য যে বিরতি এসে পড়ে সেই বিরতিকে উপচ্ছেদ বলা হয়। পূর্ণচ্ছেদের বিরতি অর্ধচ্ছেদের চেয়ে দীর্ঘতর—

ফাগুন এল দ্বারে / কেহ যে ঘরে নাই ॥
পরাণ ডাকে কারে / ভাবিয়া নাহি পাই ॥

'দ্বারে ও কারে'র পর পড়েছে অর্ধচ্ছেদ এবং 'নাই ও পাই'র পর পড়েছে পূর্ণচ্ছেদ। তবে মনে রাখতে হবে—'যতি' ও 'ছেদ' ঠিক বস্তু নয়। কবিতার অর্থদ্যোতনার জন্য এবং শ্বাস নেবার জন্য যে ক্ষণিক বিরতি ঘটে তাকে ছেদ বা Sense pause বলে। এবং কবিতার একটি চরণের যতটুকু অংশ এক একটি ঝোঁকে (Impulse) উচ্চারিত হয় সেই উচ্চারিত অংশের পর যে বিরতি আসে তাকে যতি বা Metrical pause বলা হয়, এবং ঠিক সেই ভাবেই অংশগুলোকে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

সুদূর গগনে / কাহারে সে চায় ? //
ঘাট ছেড়ে ঘট / কোথা ভেসে যায় ? //

নব মালতীর / কচিদলগুলি / আনমনে কাটে / দশনে //

'/' টান যতির নির্দেশক আর '//' টান ছেদের নির্দেশক।

যতি দিয়েই ছন্দের ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলে। ছেদ—অর্থপ্রকাশের একান্ত সহায়ক। লঘু যতি, অর্ধ যতি, পূর্ণ যতি—নীচে দেখান হ'ল—

"যাহারা তোমার / বিষাইছে বায়ু // নিভাইছে তব / আলো।

/ =লঘু, // =অর্ধ, '/' =লঘু, । =পূর্ণচ্ছেদ

পর্ব যতি লোপ :

লজ্জা দিয়ে / /সজ্জা দিয়ে // দিয়ে আব /-রণ,

তোমারে দূর্ : লভ করি // করেছে গো : পন।

পর্বযতি লোপ করা হয়েছে : চিহ্ন দিয়ে।

চরণ : ইংরাজীতে একে বলা হয় Metrical line (Verse)। পূর্ণযতি যেখানে ধ্বনি প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে সেখানে সেই নিয়ন্ত্রিত পূর্ণধ্বনি-প্রবাহকে চরণ বলে। কয়েকটি পর্ব মিলে একটি চরণ গঠিত হয়। এক, দুই এবং তিন পঙ্‌ক্তির চরণও হতে পারে। সুতরাং চরণ ও পঙ্‌ক্তি এক বস্তু নয়। অনুপ্রাস বোঝার জন্যই সাধারণতঃ চরণকে নানা ভাবে ঢেলে সাজান হয়ে থাকে। চরণকে দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতিতে সাজান যেতে পারে। সম, অসব পর্ব দিয়েও 'চরণ' তৈরী হয়ে থাকে—

'চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
সসধর বরিখব আগি' (ত্রিপদী)

"গোরা অভিষেক কথা অদ্ভুত কথন
শুনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ" (দ্বিপদী)

"হেথা দূতী রাই মনে ছিলা"। (একপদী)

"কাঁকন-জোড়া এনে দিলেন যবে
ভেবেছিলাম হয়তো খুশি হবে।" (একপদী)

"নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা।
সোনার আঁচল খসা,।
হাতে দীপ শিখা"। (ত্রিপদী)

"দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে।
ছায়ার মতো চরণ দেশে।
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে।
আর বসে না রইব"। (চৌপদী)

"হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন"।
(অসম পর্বে গঠিত চরণ।)

"সকাল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়" (একপদী/রবীন্দ্রনাথ)

একে রবীন্দ্রনাথ বলেছে—এক চরণ। অমূল্যধন বলেছেন—দুই চরণ। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমার বক্তব্য এই লেখার পঙ্‌ক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজন মতো পা মুড়ে বসতে পারি, তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে পা বলে স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়।"

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত বলেই আমাদের বিশ্বাস। পর্ব ও পর্বাঙ্গবাদের ওপর ভিত্তি করে চলা সর্বত্র চলে না। কারণ—প্রথম পঙ্‌ক্তির মধ্যে কবির বক্তব্য পরিস্ফুট হয়নি, হয়েছে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিকে অবলম্বন করে—সুতরাং দু'টো মিলে এক হবে।

পর্ব ও পর্বাঙ্গ : (Bar and beat চরণের যেখানে অর্ধযতি পড়ে সেই অংশগুলোকে পর্বাঙ্গ বলা হয়—

১১ ১ ১১ ১ ১১ ১১ ১১ ১ ১ ১
সকাল বেলা / কাটিয়া গেল / বিকাল নাহি / যায়

সকাল বেলা—পর্ব ; কাটিয়া গেল—পর্ব ; বিকাল নাহি—পর্ব প্রতিটি পর্বের মাত্রা সংখ্যা—৫।

কিন্তু 'যায়' এর মাত্রা সংখ্যা—২। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ পর্ব নয়। এই অ-পূর্ণাঙ্গকে বলা হয়—অপূর্ণ পর্ব।

পর্ব, অপূর্ণ পর্ব ছাড়াও মাঝে মাঝে পদ্যে "অতিপর্ব" পাওয়া যায়। অপূর্ণ থাকে শেষে। এবং অতিপর্ব থাকে আদিতে—

যব গোধূলি সময় / বেলি
ধনি মন্দির বাহির / ভেলি।

'যব' ও 'ধনি' — অতিপর্ব।

'গোধূলি সময়' এবং 'মন্দির বাহির' = পর্ব ; বেলি, ভেলি = অপূর্ণ পর্ব। সুতরাং বলা যেতে পারে—অতিপর্ব+পর্ব+অপূর্ণ পর্ব=চরণ। বাংলা ছন্দের বিচারে পর্বের গুরুত্ব অনেক—একথা অমূল্যধন বার বার করে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে পর্বের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে বাংলা ছন্দের গতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে এবং যাঁরা 'পর্ব' এর ওপর নির্ভর না করে ছন্দের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করেন—অমূল্যধনের মতে তাঁরা ছন্দের মূল বস্তুটি ধরতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ পব পর্বাঙ্গের ওপর কোনো গুরুত্ব দেন নি। তিনি ছন্দের জাত নির্ণয় করার ক্ষেত্রে 'চালের' দিকে জোর না দিয়ে 'চলনে'র দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড় গতি আর একটি ছোট গতি। অর্থাৎ 'চাল' এবং 'চলন'। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। তিনি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

১ ২ ৩ ৪
শারদ চন্দ পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ
৫ ৬ ৭ ৮
ফুল্ল মল্লি মালতি যূথি মত্তমধুপ ভোরণী

তিনি বলেছেন—"প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করছে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্ছে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা—

১ ২ ৩ ৪
মহা ভার তের কথা অমৃত স মান
৫ ৬ ৭ ৮
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্য বান

এরও আট পদক্ষেপ।

ছন্দের মাত্রা নির্দ্ধারণ পদ্ধতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অমূল্যধনের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি—

আঁধার রজনী পোহাল
জগৎ পুরিল পুলকে।

রবীন্দ্রনাথের মতে এই গানটি নয় মাত্রার ছন্দে রচিত (৩+৩+৩)। অমূল্যধনের মতে এ হচ্ছে ছয় মাত্রার—অর্থাৎ তিনি বলেছেন—

৬ ৩
আঁধার রজনী / পোহালো=৯।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—যে" এর পূর্ণভাগ নয় মাত্রার এবং আংশিক ভাগ হচ্ছে ৩+৩+৩। এই গানটির পুনরাবর্তন ঘটেছে নয় মাত্রার পর। যেমন একটি বাহু— তারও তিনটি পর্ব (অংশ) রয়েছে—মণিবন্ধ পর্যন্ত এক, এটি ছোট পর্ব, কনুই পর্যন্ত— দুই, কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত—তিন। সব মিলে বাহু অর্থাৎ তিনের যোগফল দাঁড়াচ্ছে বাহু। আমাদের এক বাহু আর এক বাহুর পুনরাবৃত্তি মাত্র। —"আঁধার রজনী পোহালো" গানটির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে অর্থাৎ সম এসে দাঁড়াচ্ছে নয় মাত্রার পর।

মাত্রা বিচারে রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা ছন্দ তিন জাতের—সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষম চলনের ছন্দ। দু'মাত্রার চলনকে 'সম মাত্রা'র ছন্দ, 'তিন মাত্রার চলনকে 'অসম মাত্রা'র এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে 'বিষম মাত্রা'র ছন্দ হিসাবে তিনি ধরেছেন—

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে পিছু পানে চায়=১৪
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে চলা হল দায়। ১৪

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই হল দুই মাত্রার চলন। দুই বা গুণফল চার বা আটকেও আমরা একই জাতির গণ্য করি।

যাঁরা ছন্দ বিচারে রবীন্দ্রনাথের মতবাদকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন, তাঁরা ঐ চরণ দুটোকে এমনি ভাবে পর্ব বিভাগ করেছেন—

ফিরে ফিরে আঁখি নীরে / পিছু পানে চায়=৮+৬=১৪
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে / চলা হল দায় =৮+৬=১৪

অসম ছন্দ : (তিন মাত্রার)

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ২
নয়ন / ধারায় / পথ যে / হারায় / চায় সে / পিছন / পানে
চলিতে / চলিতে / চরণ / চলে না / ব্যথার / বিষম / টানে

বিষম মাত্রার ছন্দ :

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২
যতই চলে / চোখের জলে / নয়ন ভ'রে / ওঠে
চরণ বাধে / পরাণ কাঁদে / পিছনে মন / ছোটে।

স্তবক : (Stanza) দুটো বা তার বেশি চরণ সুন্দর ও সার্থকভাবে পরস্পর সন্নিবিষ্ট হ'লে তাকে স্তবক বলা হয়। বাংলা কবিতায় দুই থেকে দশ চরণের স্তবক

দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি স্তবকে কবিতার ভাবটি অন্ততঃ আংশিক ভাবে বিধৃত হয়ে থাকে।

"নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।" (দুই চরণের স্তবক)

"আকাশের ওই আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই লাগে
সেই মিলনের তড়িৎ-তাপন
নিখিলের রূপে জাগে।"
(চার চরণের স্তবক)

মাত্রা ঃ (Mora) বাংলা অক্ষরের যেমন 'ধ্বনিগৌরব' (accent) রয়েছে ঠিক তেমনি 'মাত্রাগৌরব'ও রয়েছে। বাংলা ছন্দ মাত্রাগত। যাকে ইংরাজীতে বলা যেতে পারে Quantative। এই মাত্রা হল সময় বা কাল পরিমাণ, অর্থাৎ একটি অক্ষর উচ্চারণ করতে যে সময়ের প্রয়োজন সেই অনুযায়ী অক্ষরের মাত্রা নিৰ্দ্ধারণ করা হয়। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে সংস্কৃত-উচ্চারণে ধ্বনির দীর্ঘহ্রস্বতা স্থির নির্দিষ্ট। বাংলাতে তা নয়। সেজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গুণেই নিশ্চিন্ত নয়, নির্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রাকে সাজাতে হয়—তবেই তাতে ছন্দ জাগে।

অক্ষরের মাত্রা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বাংলা অক্ষরের মাত্রা বাঙালী মেয়েদের চুলের মতো, কখনো আঁট করে বাঁধা আবার কখনো এলো খোঁপা। তাই আবার বলেছেন "অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনি মাত্রা গণনা বাংলায় চলেনা"—যেমন—

"মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—হিং টিং ছট্।"

এই পঙ্‌ক্তি দুটোর পর্ব করে দেখান হচ্ছে—যে এখানে অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের মাত্রা গণনা চলেনি—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ২
"মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস / ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে / হিং টিং ছট ॥"

প্রথম পঙ্‌ক্তিটিতে রয়েছে—১৫টি অক্ষর

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটিতে রয়েছে—১২টি অক্ষর ('ং' বাদে) এর মাত্রা গণনা হবে এই ভাবে—প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা, এবং দ্বিতীয় অপূর্ণ পর্বের মাত্রা হবে— ৬ ; ছাড়িয়া=৩ ; উৎ—উচ্চারণে 'ৎ' এর কোনো প্রাধান্য নেই ফলে উৎ=১ : কণ্ট=২ =৩।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ব্যতিক্রম রয়েছে—১ম পর্বে 'ৎ' এর উচ্চারণ পূর্ববর্তী অক্ষরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়নি এবং 'ৎ' উচ্চারণের পরেও একটু রেশ রয়ে গিয়ে—

১ ১ ১ ১১ ১ ১১

হ ঠা ৎ = ৩ হল, ফুকারী = ৩, উঠে = ২ মোট ৩+৩+২=৮।

হিং টিং ছট্‌ (অক্ষরবৃত্তে, 'ং' এর মাত্রা সাধারণতঃ দেওয়া হয় না)।

"উৎসব শেষে মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে"

এখানেও 'উৎ'=১ মাত্রা, আবার 'মৃৎ' দুই মাত্রা।

এখানে 'হিং' 'টিং' সব দু'মাত্রার মূল্য পেয়েছে—অর্থাৎ খোঁপা এখানে "এলো খোঁপা" এবং ছট্‌=২ মাত্রা মোট ৬ মাত্রা।

৮+৬=১৪ ; ৮+৬=১৪=অক্ষরবৃত্ত, তান প্রধান বা মিশ্রকলাবৃত্ত, ধীর লয়ের ছন্দ। দ্বিপদী, লঘু পয়ার।

মাত্রা পদ্ধতি : এ সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে—

(১) কোনো পর্বাঙ্গে একাধিক প্রভাব মাত্রিক অক্ষর যেন না থাকে (এখানেও ব্যতিক্রম রয়েছে—"দেশ দেশ নন্দিত করি" এখানে 'দে'+'দে' দুটোর উচ্চারণই প্রভাব-মাত্রিক)।

(২) প্রভাব-মাত্রিক অক্ষরের সঙ্গে বিপরীত গতির অক্ষর একই পর্বাঙ্গে বসতে পারবে না অর্থাৎ একই পর্বাঙ্গে অতিদ্রুত অক্ষরের সঙ্গে বিলম্বিত বা অতিবিলম্বিত এবং অতি বিলম্বিতের সঙ্গে ধীর দ্রুত ব্যবহৃত হতে পারবেনা (তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে যাঁরা জাত কবি তাঁদের রচনা বা শব্দ চয়ন স্বতঃস্ফূর্ত—'পৃথগ যত্ননির্বর্ত্য' নয়) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন
গীত রস ধারা করি সিঞ্চন" এর মধ্যে ছন্দের ব্যাকরণ থাকবে পেছনে পেছনে—"দাসীর" মতো।

মাত্রা বিচার : ছন্দে মাত্রা হিসাব করতে হ'লে নিচে দেওয়া কথা কয়টি মনে রাখতে হবে—

(১) সব কবিতা একই লয়ের নয়—কোনোটা 'দ্রুত লয়ের' কবিতা, কোনোটা 'ধীর লয়ের'

কবিতা আবার কোনো কোনো কবিতা বিলম্বিত লয়ের কবিতা। যেমন গানের লয় হিসেবে "তাল" ঠিক করা হয় (কাহারবা, ঢিমে তেতালা, দ্রুত তেতালা), ঠিক তেমনি লয় ধরে কবিতার 'জাত' ঠিক করে মাত্রা নির্দ্ধারিত করতে হবে।

(২) পর্বাঙ্গ বিন্যাসে যে রীতি রয়েছে—তাকেও অনুসরণ করতে হবে—৩+৩+২=৮ কে ৩+২+৩=৮ করতে গেলে ছন্দ পতন হবে। অর্থাৎ 'তাল' তলা দিয়ে যেতে হবে—'তাল' তলিয়ে দিয়ে নয়।

(৩) অমূল্যধনের মতে শব্দকে না ভেঙে আস্ত রেখে পর্ব-বিভাগ করা উচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা মানেনি। তাঁর মত হচ্ছে প্রয়োজন বোধে শব্দকে ভেঙেও পর্ব ভাগ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত অমূল্যধনও বাধ্য হয়েছেন—শব্দকে ভেঙে পর্ব বিভাগ করতে। আনন্দ মোহন বসু তাঁর বাংলা পদাবলীর ছন্দ গ্রন্থে শব্দকে ভেঙে পর্ব বিভাগ করেছেন, যেমন—

৫ ৫ ৫ ২

সাগর জলে / সিনান করি / সজল এলো / চুলে

বসিয়াছিলে / উপল উপ / কূলে। (রবীন্দ্রনাথ)

কি পেখলু / গৌর কি : শো-র। ১১

সুরধনি / তী-রে উ : জো-র ॥ ১১ (আনন্দ মোহন বসু)

তেজিয়া কা : লিন্দী তীর // কদম্ব বি : লাস=১৪

এবে সিন্ধু / তীরে কেনে // কিবা অভি : লাষ=ঐ

(আনন্দ মোহন বসু।)

৪ ৪ ৪ ২

ঘুম্ যাবে সে / দুধের্ ফেনা / ফুলের্ বিছা / নায়

রেল গাড়ি ধায় / হেরিলাম হায় / নামি বর্দ্ধ / মানে

কোথায় শিষ্য / ভুলেছ ভাষ্য / মাধবীর সৌ / রভে।

(অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় / বাংলা ছন্দের মূল সূত্র পৃঃ ৪৯)

ছন্দের মাত্রা বিচার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত হচ্ছে যে ছন্দের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে কবিতা পড়ে, কান পেতে, নিয়ম পেতে নয়—তিনি বলেছেন—"আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতঃই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে এ কাজ করিনে, অন্তত সজ্ঞানে নয়।" এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মতদ্বৈধ রয়েছে। প্রবোধ চন্দ্রের এক

সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"প্রবোধ চন্দ্র সেন এই বলে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে—আমরা একটা কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে, পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে, তার চোখ ভুলিয়ে এসেছি, আমরা ধ্বনি চুরি করে থাকি অক্ষরের আড়ালে।" তা যে নয়, তা উদাহরণ ('ছন্দ' বইয়ে) দিয়ে বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন—

+
উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
+ ।
মোর চিত্ত মাঝে
+
চির নূতনেরে দিল ডাক
।
পঁচিশে বৈশাখ।

।=এক মাত্রা + = দুই মাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ 'উদয়' কে তিন মাত্রা ধরেছেন এবং 'দিগন্ত'কেও ৩ মাত্রা ধরেছেন। 'উদয়'এর 'অয়'=২ মাত্রা, 'দিগন্ত' এর অন্=১ মাত্রা। এই মাত্রা বিচারের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

(১) বাংলায় স্বরবর্ণ সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না।

(২) বাংলায় তার একটা নিজস্ব নিয়ম রয়েছে।

(৩) বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়—জল, (জ+অ+ল), চাঁদ (চাঁ+আ+দ)। এই রীতি গোড়া থেকেই চলে আসছে।

প্রবোধ চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'ঐ' এবং 'ওই' বানান নিয়েও আপত্তি তুলেছেন। তার উত্তরেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"ও-ই দেখো, খোকা ফাউন্টেন পেন মুখে পুরেছে"

এখানে দীর্ঘ ওকারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যদি বলি—'ঐ দেখো, খোকা ফাউন্টেন পেনটা খেয়ে ফেললে বুঝি' তখন হ্রস্ব 'ঐ'কার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না। বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিতে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো-কমানো যায় বলেই ছন্দে তার গৌরব বা লাঘব নিয়ে আজ পর্যন্ত দলাদলি হয়নি"। অর্থাৎ খোঁপাকে কখন 'এলো' কখনো 'টাইট' করে চলার মতই।

রবীন্দ্রনাথ ঐটুকু বলেই থামেন নি, সাধারণ পাঠক পাঠিকারা যাতে জিনিষ-গুলো ঠিক মতো বুঝতে পারেন, তার উদাহরণও দিয়েছেন—

"মনে পড়ে দুই জনে জুঁই তুলে বাল্যে
নিরালায় বনছায় গেঁথেছিনু মাল্যে।
দোঁহার তরুণ প্রাণ বেঁধে দিল গন্ধে
আলোয়-আঁধারে মেশা নিভৃত আনন্দে।"

'দুই', 'জুঁই'—আপন আপন উ-কারকে দীর্ঘ করেছে।

আবার-

"এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।"

এখানে 'এই, সেই, কই' হ্রস্ব হয়ে পড়েছে।

আবার অনেক সময় মাত্রা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে 'শব্দ'কে সংক্ষিপ্ত করেও নিতে হয়, নইলে ছন্দ পতন হবে—

৮ ৬
"মরমে লাগল গোরা / না যায় পাসরা
নয়নে অঞ্জন হইয়া / লাগিয়াছে পারা
জলের ভিতরে ডুবি / সেথা দেখি গোরা
ত্রিভুবনময় গোরা / চাঁদ হইল পারা"

এখানে 'হইয়া' পড়তে হবে 'হৈয়া' এবং দু-মাত্রা হবে, ঠিক তেমনি 'হইল' পড়তে হবে 'হৈল' এবং এখানেও ২ মাত্রা—'ইয়া' গৌরব হানি হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য

বাংলা ছন্দের বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখে বিশেষজ্ঞেরা যে কয়টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—তা নিচে দেওয়া হল—

১) বাংলায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য অথবা মাত্রা হিসেব করেই ছন্দোরচনা হয়ে থাকে।

২) বাংলা ছন্দ মাত্রাসমক-জাতীয়—অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিভাগে মোটামুটি একটা পরিমিত মাত্রা থাকা দরকার।

৩) বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্যের চেয়ে ঐক্যের প্রাধান্যই বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়।

৪) প্রশ্বাসের ঝোঁকের মাত্রাই বাংলা ছন্দের একটি বিশেষ সম্পদ।

৫) প্রতি সমতা (Symmetry) বাংলা ছন্দের একটি প্রধান গুণ ; বাংলা ছন্দের আদর্শ—জোড়ায় জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলোকে সাজানো। এরই ফলে দুয়ের গুণিতক ফল দাঁড়ায় গিয়ে চারে। এবং এই সংখ্যাগুলোরই প্রাধান্য দেখতে পাই বাংলা ছন্দে।

৬) সাধারণতঃ বাংলা কবিতায় চরণে দুই বা চার পর্ব থাকে।

৭) বাংলার চির প্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদ মধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না।

৮) বাগ্‌যন্ত্রের আরামপ্রিয়তার জন্য যৌগিক অক্ষর থাকলেই বাগ্‌যন্ত্রকে একটু বিরাম দেওয়া হয়ে থাকে—অতি ভৈরব=অ+তি+ভৈ(ই)+র+ব।

৯) বাংলা মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতের মতো হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার নেই—যদিও একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে।

১০) স্বরমাত্রিক ছন্দে স্বরের প্রাধান্য বেশি—সেখানে অক্ষরের ওপর সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত পড়ে—ফলে দু'জাতের অক্ষরের অস্তিত্ব অনুভূত হয়।

১১) বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষর সুকৌশলে প্রয়োগ করা হয়েছে—সেখানে কিছুটা সংস্কৃত বৃত্তছন্দের মতো মন্থর, গভীর ও উদার ভাবের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়—"সশঙ্ক লঙ্কেশ শূরে স্মরিলা শঙ্করে।" অথবা "কিম্বা বিম্বাধরা

রমা অম্বুরাশি তলে” প্রভৃতিতে একটা গাম্ভীর্য দেখা দিয়েছে। এ ছন্দে পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয় না, এখানে কোনো রকম বিরামের অবসর থাকে না—সুতরাং ব্যঞ্জন বর্ণের একটা সংঘাত অনুভূত হয়।

১২) বাংলা ছন্দে যতির অবস্থান এবং তার জন্য ছন্দোবিভাগে একটা ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়।

১৩) বাংলায় প্রতিষম ছন্দোবিভাগগুলো সাধারণতঃ এক ছাঁচে হয় না।

১৪) বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ খোঁচ-খাঁচ কম সুতরাং কোনো একটি ছাঁচে ফেলে পর্ব বা পর্বাঙ্গ গঠন করা কঠিন হয়ে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এক একটা ছাঁচ অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু সব সময় সমতা রক্ষিত হয়নি।

১৫) শ্বাসাঘাতযুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছাঁচের পর্বই চালু। ছাঁচ বদলে গেলেও ছন্দের হানি হয় না—

“মস্‌গুল : বুলবুল / বনফুল : গন্ধে
বিলকুল : অলিকুল / গুঞ্জরে : ছন্দে”

এ পঙ্‌ক্তি দুটোতে পর্বের ছাঁচ এক নয়, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ছাঁচ বদলে দেওয়া হয়েছে—তথাপি পড়বার সময় ছাঁচের পরিবর্তন বিশেষ ভাবে অনুভূত হয় না। পর্ব ও পর্বাঙ্গে সংখ্যা ও মাত্রা সমান রয়েছে বলে ছন্দের ঐক্যবোধ রয়েছে— এবং বৈচিত্র্যের আভাষ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে
বাংলা ছন্দ
(প্রাক্ রবীন্দ্রনাথ)

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা ছন্দে যে ঢেউ উঠেছিল—তা সুদূর প্রসারী এবং সেই ঢেউ এসে পড়েছে রবীন্দ্র-কাব্য সাগরে। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কিছু সংস্কৃত ছন্দকে বাংলার ছন্দভূমিতে বপন করে কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। এমন কি গ্রাম্য সুরেও কিছুটা নোতুনত্ব এনেছেন—

ধামালী :

"উমার কেশ চামর ছটা
তামার শলা চূড়ায় জটা,
তায় দেখিয়া ফোঁফায় ফণী
দেখে আসে জ্বর লো"

এই ধামালী জাতীয় ছন্দেই ফুটেছে আধুনিক শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত প্রধান ছন্দের রূপ-বৈচিত্র্য। বস্তুত একে ধামালী না বলে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ বলাই শ্রেয়।

"আমার উমা মেয়ের চূড়া ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে, পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর লো" ॥

মালঝাঁপ : এই ছন্দে মোট চারটি পর্ব থাকে, তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পর্বের অন্ত্যে মিল থাকবে এবং শেষ পর্বটি থাক্‌বে মুক্ত—

"কো্তোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাকে
ধরিবাণ খরশাণ হানাহান হাঁকে।"

ভুজঙ্গ প্রয়াত : সংস্কৃত ভুজঙ্গ প্রয়াতের অনুসরণে—

"ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।"

তূণক ঃ

"মৈল দক্ষভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে
ভারতের তূণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে।"

"ছন্দোবন্ধ বাড়িছে"—কবির এই উক্তি সর্বৈবভাবে সত্য। এই সাফল্যে বাংলা কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে, ঐশ্বর্যও বেড়েছে। পয়ার-লাচাড়ীর বাঁধাধরা প্রয়োগে বাংলা কাব্যের গঠন-রীতি যে ভাবে শিথিল হয়ে পড়তে সুরু করেছিল, ভারতচন্দ্রের হাতে আবার জোয়ার এসেছিল।

অণ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের পর আর সেরকম প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব ঘটেনি। তখন কবিওয়ালার যুগ সুরু হয়।

রাম প্রসাদ ঃ সাধক-কবি রাম প্রসাদের কাব্যে ছড়ার ছন্দ দেখতে পাই—

"শিব্ যদি হয় / সত্যবাদী
তবে কি তো : মা-য় সাধি
(মা গো, ওমা) ফ.কির উ : পরে ফাঁকি
ডা-ন চক্ষু / নাচে" ৪ / ৪ / ৪ / ৪ / ৪ / ২

"জাক্ জমকে / করলে পূজা // অহংকার হয় / মনে মনে
(তুমি) লুকিয়ে তারে / কর্‌বে পূজা // জান্‌বে নারে / জগজ্জনে" ॥

বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের রচনায়ও শ্বাসাঘাত ছন্দের কবিতার নিদর্শনের অভাব নেই—

"যখন্ আমি / বৈসা থাকি // গুরুজনার / কাছে
(তুমি) নাম ধৈরা / বাজাও বাঁশী // আমি মরি / লাজে।"

শক্তিপূজার জয়স্তোত্র রচনাতেও মুসলমান কবির ছড়ার ছন্দ প্রয়োগ করেছেন—

"দোহাই লাগে / ত্রিপুরারী যদি কর / জোর জবরি
সাম্‌নে আছে / জজ্ কাছারী
আইনের্ মত / রসিদ্ দিব
জামিন্ দিব / ত্রিপুরারী।"

(মিরজা হোসেন আলী)

বাউল সাধকেরাও এই ছন্দ প্রয়োগ করেছেন—

"খাঁচার ভিতর / অচিন্ পাখী // কেম্‌নে আসে / যায়
ধর্‌তে পার্‌লে / মনবেড়ী // দিতাম্ তাহার্ / পায়"   ৪ / ৪ / ৪ / ২

"ঢপ কীর্তনে"ও শ্বাসাঘাত ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে—

"রাজ্‌নন্দিনী / পড়্‌লো ধরায়্
(ওমা) তোরা ধর্ আয় / ধর্ আয়
কমলিনী / আয়্ গো তোরা / এরাই যেন / যায়্ মথুরায়্।"

ঊনবিংশ শতাব্দী

(বাংলা ছন্দ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবির গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বঙ্কিম চন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর কাব্য জীবন সুরু করেন কবিতা লেখা দিয়ে এবং 'ললিতা ও মানস' তাঁর প্রথম ও শেষ কাব্য। তবে তিনি তার উপন্যাসে কিছু বৈষ্ণবপদ (ব্রজবুলিতে) গান হিসেবে রচনা করেছিলেন। দীনবন্ধু নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেও তাঁর গদ্য ও পদ্য দুই ছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত নবীন কবিদের কাব্য রচনায় উৎসাহ দিতেন এবং তাঁর সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকরে" নবীন কবিদের লেখা ছাপতেন। নিজেও ছিলেন কবি। তিনি বাংলার কবি এবং বাঙালীয়ানার বিশুদ্ধ কবি ছিলেন, উপরন্তু ছিলেন মেকীর ওপর চটা। বিলাতী আচার বিচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এবং যে সব বাঙালী, সাহেবদের অনুকরণ করতেন তাঁদের তিনি ব্যঙ্গবাণে বিধ্বস্ত করতেন। পয়ার, ত্রিপদী, (অক্ষরবৃত্ত) ছাড়া তিনি হাস্যরস সৃষ্টির জন্য ছড়ার ছন্দে কবিতা লিখেছেন—

"আগে মেয়ে / গুলো ছিল / ভালো
ব্রতধর্ম / কোর্ত্তো সবে
একা বেথুন্ / ক্রমে শেষ ক / রেছে
আর্ কি তাদের্ / তেমন্ পাবে।"

ধিতা ধিনা পাকালোনা ছন্দ—

"নোড়্‌বো না তো, / লোড়বো সুখে
পোড়্‌বো রুকে / চোড়বো বুকে।
শত্রু যদি / আসে ঝুঁকে
থাব্‌ড়া কোষে / মার্ব্ব বুকে।
জোম্‌কে আমি / বোল্‌বো যবে
চোম্‌কে যাবে / দেব্‌তা সবে।"

অথবা

কেমন্‌ পুকুর / কেমন কুকুর / কেমন্‌ হাতের / কোড়া
কেমন এ ঘড়ি / কেমন এ ছড়ি / কেমন্‌ ফুলের / তোড়া

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে যেমন যুগান্তর এনেছেন, ঠিক তেমনি বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছেন। তিনি বাংলা ছন্দ পয়ারের বেড়ি ছিন্ন করে Milton এর Blank Verse এর অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিদেশি-প্রভাবজাত সন্দেহ নেই কিন্তু বিদেশি বস্তু নয়, আসলে এ পয়ার ছন্দ। পার্থক্য হচ্ছে—পুরানো পয়ারে যেমন দুটো চরণে শেষ যতি পড়ে, অমিত্রাক্ষরে তা নয়। উপরন্তু পদান্তে অন্ত্যানুপ্রাস পয়ারে থাকে—অমিত্রাক্ষরে তা থাকে না। পয়ারে মিলের বন্ধনীতে দুই চরণের মধ্যে বাক্য শেষ করতে হবে, অমিত্রাক্ষরে তা করা হয় না।

মধুসূদন তাঁর "তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্যেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন তবে এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন নি, মেঘনাদে তা পূর্ণবিকশিত হলেও মাঝে মাঝে ছন্দ পতন হয়েছে কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যে ছন্দ একেবারে ত্রুটিহীন।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের ছন্দে মধুসূদন যে স্বাধীনতা দেখিয়েছেন—যতি সংখ্যায়, ছত্র সংখ্যায়, মিলে এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে—সে স্বাধীনতা অমিত্রাক্ষর পয়ার-প্রবর্তনের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলায় প্রথম 'ওড্‌' অর্থাৎ অসমচরণ লিরিক কবিতা হিসেবেও ব্রজাঙ্গনার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে—

যতি সংখ্যার ও মিলে—

হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির, কহ গো আমারে

যতি সংখ্যার ও মিলের স্বাধীনতা—

"হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির, কহ গো আমারে
বসন্ত বিহনে।"

ছত্র-সংখ্যার স্বাধীনতা :

কেনে এত ফুল তুলিলি সজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ?

মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে—

সখিরে
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটলে
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল
চল লো বনে।
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখ ব্রজরমণে।

মধুসূদনের অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—চতুর্দ্দশপদী কবিতা (Sonet)। এক্ষেত্রে তিনি পেত্রার্কা, মিল্টন সেক্স্পীয়রের অনুকরণ করেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অক্ষর বৃত্ত

অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে তানপ্রধান বা ধীর লয়ের ছন্দ বলা হয়। প্রবোধচন্দ্র এর নাম দিয়েছেন "মিশ্রকলাবৃত্ত" ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এর নামকরণ করেছেন "সাধু-বাংলার ছন্দ"। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

ক) স্বরের হ্রস্ব বা দীর্ঘ বিচারের কোনো অবকাশ নেই।

খ) অক্ষরবৃত্তে প্রতিটি অক্ষর একমাত্রার। তবে রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করেন না।

গ) যদি কোনো শব্দের শেষে হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর থাকে তাহ'লে দু'মাত্রার হবে, তবে সর্বত্র এ নীতিও অনুসৃত হয়নি। হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রা ধরে উচ্চারণ করতে গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত হওয়া দরকার। কিন্তু তাতে স্বর-গাম্ভীর্য কমে আসে, এবং এটা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এতে স্বাভাবিক উচ্চারণের বিরোধী হয়ে পড়ে, সুতরাং পয়ার জাতীয় ছন্দে অন্তিম হলন্ত অক্ষরকে একমাত্রা না ধরে দুমাত্রা ধরাই উচিত।

ঘ) এই ছন্দে অক্ষর-ধ্বনির চেয়ে সুরের প্রবাহ চরণের মধ্যে বিচিত্র ভাবে প্রকাশ লাভ করে।

ঙ) এই ছন্দে যেমন যুক্তাক্ষর বর্জিত চরণ রচনা করা যায় তেমনি যুক্তাক্ষর-বহুল চরণ রচনা করতে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না।

চ) হ্রস্ব দীর্ঘস্বরের যেমন সংকোচন-প্রসারণ ঘটে তেমনি যুগ্মধ্বনিতেও সংকোচন-প্রসারণ ঘটে।

ছ) এই ছন্দের তানপ্রবাহের জন্যে লঘু-গুরু অক্ষরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যও দেখতে পাওয়া যায়।

জ) এই ছন্দে স্থৈর্য ও গতি পাশাপাশি থাকার ফলে কিছুটা গতি মন্থরতা এসেছে।

ঝ) গাম্ভীর্য ও সংযম বেশি থাকায় এই ছন্দে শুধু কবিতা নয় মহাকাব্যও রচিত হ'তে পারে।

ঞ) অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্য অক্ষরবৃত্তের রূপকল্পই বিশেষ ভাবে গ্রহণযোগ্য।

ট) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার করা চলে।

ঠ) ং, ঃ, ৎ প্রভৃতিকে গণনার বাইরে রাখা হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনবোধে মাত্রা গণনার ভেতর রাখতে হবেই বলে মন্তব্য করেছেন।

ড) টানা সুরের প্রবাহ এই ছন্দের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ঢ) অক্ষরবৃত্ত পয়ারের ভিত্তিতেই রচিত এবং এর শোষণ শক্তি রয়েছে—একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

পয়ার ঃ বাংলা পয়ারের জন্ম ইতিহাস আগেই দেওয়া হয়েছে। 'চতুষ্পদী' থেকে এর জন্ম। পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ তাই অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান বা মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দে সাধারণতঃ স্বভাব মাত্রিক অক্ষরই ব্যবহৃত হয়, আবার লঘু গুরু, তৎসম, অর্ধতৎসম সবরকম অক্ষর দিয়ে গঠিত হতে পারে। পয়ারজাতীয় ছন্দে যে কোনো পর্বাঙ্গের পরেই ছেদ বসান যায়, কেবল উপচ্ছেদ নয়, পূর্ণচ্ছেদও বসান চলে। পয়ারে শব্দের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখা যায় বলেই এরূপ করা চলে।

সাধারণতঃ পয়ার চোদ্দ অক্ষরের দুটো চরণে গঠিত। দুই চরণের শেষে অনুপ্রাস থাকে প্রতি চরণে অষ্টম অক্ষরে অর্ধযতি এবং চতুর্দশ অক্ষরে পূর্ণযতি পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এভাবে পর্ব বিভাগ সব সময়ে মানেননি। চোদ্দ অক্ষর ঠিক রেখে তিনি পর্ব-পর্বাঙ্গ অনেক ভাবে বিভাগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"দুই মাত্রা বা দুই মাত্রার গুণক নিয়ে যে সব ছন্দ তারা পদাতিক, বোঝা সামলিয়ে ধীর পদক্ষেপে তাদের চাল। এই জাতের ছন্দকে পয়ার শ্রেণীর বলব। সাধারণ পয়ারে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে দুটি করে ভাগ, ধ্বনির মাত্রা ও যতির মাত্রা মিলিয়ে প্রত্যেক ভাগে আটটি করে মাত্রা, সুতরাং সমগ্র পয়ারের ধ্বনি মাত্রা সংখ্যা চোদ্দ এবং তার সঙ্গে মিলেছে যতি মাত্রা সংখ্যা দুই, অতএব সর্বসমেত ষোলো মাত্রা"। তিনি উদাহরণ দিয়ে তার বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন—

৮ ৮
বচন নাহি তো মুখে / তবু মুখ খানি o o
হৃদয়ে কানে বলে / নয়নের বাণী o o।

চোদ্দ মাত্রা হলেই যে পয়ার হবে—তাও তিনি স্বীকার করেন নি। চোদ্দ মাত্রার কোনো কবিতার চাল যদি **দুলকিচাল** হয় তবে দেখা যাবে যে পয়ারের কৌলিন্য আর বজায় থাকে না—

কেন / তার / মুখ / ভার / বুক / ধুক / ধুক / o o
চোখ / লাল / লাজে / গাল / রাঙা / টুক / টুক oo

তিনি আরও বলেছেন যে চার মাত্রার ওপর ঝোঁক দিয়ে পয়ার পড়া যেতে পারে—

"সুনিবিড় / শ্যামলতা / উঠিয়াছে / জেগে ০ ০
ধরণীর / বনতলে / গগনের / মেঘে" ০ ০

তিনি বলেন যে পয়ারের বুনানি ঠাস বুনানি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো যায়। সুর করে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে **দশ** ও শেষ ভাগে **আট** মাত্রা পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে—

১১ ১ ১ ১১ ৮
মহাভারতের কথা ০০ / অমৃত সমান ০০
কাশীরাম দাস ভনে ০০ / শুনে পুণ্যবান ০০

১০+৮=১৮ দীর্ঘ পয়ার

বিভিন্ন শ্রেণীর পয়ার (কবিতা) রয়েছে। নিচে দেওয়া হল—

(ক) তরল পয়ার ঃ চরণের চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরে মিল থাকবে—

দেখ দ্বিজ মনসিজ / জিনিয়া মুরতি
নহে ছবি কহে কবি / সুরে সুরে গাঁথা।

অলো রাই চলো যাই / যমুনার ঘাটে।

(খ) মালঝাঁপ পয়ার ঃ চতুর্থ ও অষ্টম ছাড়া দ্বাদশ অক্ষরে মিল থাকে—

জিয়ে রাখি প্রাণ পাখী / কার আঁখি তরে।

রাধা নাম অনুপাম / কহে শ্যাম নিতি।

(গ) পর্য্যায়সম পয়ার ঃ এই পয়ারে প্রথম ও তৃতীয় চরণে এক রকমের অনুপ্রাস এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে আর এক রকমের অনুপ্রাস (অন্ত্যানুপ্রাস) দেখতে পাওয়া যায়—

সকলে আমার কাছে / যত কিছু চায় (ক)
সকলেরে আমি তাহা / পেরেছি কি দিতে (খ)
আমি কি দিইনি ফাঁকি / কত জনে হায় (ক)
রেখেছি কত-না ঋণ / এই পৃথিবীতে। (খ)

(ঘ) মধ্যসম পয়ার : এই পয়ারে প্রথম ও চতুর্থ চরণে অন্ত্যানুপ্রাস এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে আর এক ধরণের অন্ত্যানুপ্রাস থাকে—

গড়নে গহন বটে / রঙেতে সবুজ (ক)
ফুলের স্ববর্ণ নহে / বর্ণচোরা চাঁপা (খ)
বৃথা তার গন্ধ ভারে / গর্ব ভরে কাঁপা (খ)
ফিরেও চাহে না তোমা / নয়ন অবুজ। (ক)

(ঙ) অমিল পয়ার : এই পয়ারে পদান্তে মিল থাকে না। অমিত্রাক্ষর (অমিল) পয়ারেরই রূপ কল্প—

সম্মুখ সমরে পড়ি / বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে / গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবি, / অমৃত ভাষিণী,
কোন বীরবরে বরি / সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ / রক্ষঃ কুলনিধি
রাঘবারি ? ॥

(চ) ভঙ্গ পয়ার : এই পয়ারে প্রথম চরণে ষোলমাত্রা, দ্বিতীয় চরণে চোদ্দ মাত্রা থাকে এবং প্রথম চরণে প্রথম পর্বের পুনরাবৃত্তি হবে—

"বিদ্যাপতি মোর নাম / বিদ্যাপতি মোর নাম
বিদ্যাধর-জাতি বাড়ি / বিদ্যাধর গ্রাম।"

(বর্তমানে এর প্রচলন আর নেই)

(ছ) ষোল মাত্রার পয়ার : এই পয়ারে দুটো করে পর্ব থাকে এবং প্রতিটি পর্ব ৮ মাত্রার—

৮ ৮
মথুরায় কেন ফুল / ফুটেছে আজি-লো সই
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে / বাঁশরি বাজিল কই ?

(জ) দীর্ঘ পয়ার : একে মহাপয়ারও বলা হয়। এই পয়ারের পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৮+১০ (১০+৮)

৮ ১০
কোথা রাত্রি, কোথা দিন / কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা
কেবা আসে কেবা যায় / কোথা বসে জীবনের মেলা।

(ঝ) **অমিল পয়ার :** এই পয়ারে পদান্তে মিল থাকে না এবং পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮+১০।

৮ ১০

এই কথা ক'ব আমি / তোমারে ভালোবেসেছি আমি
সে নহে স্বপ্ন, কল্পনা / নাইবা তুমি বাসিলে ভালো।

(ঞ) **প্রবহমান পয়ার :** এই পয়ারে অর্থযতি ও ছন্দযতি এক জায়গায় পড়ে না বা মিলে যায় না। ছেদ যতিকে ছেড়ে চলে যায়। ছেদ ও যতির মধ্যে এই বিরোধ মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রছন্দে প্রথম প্রকাশ পায়। পরে রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও আমরা পাই—

ম্লান হয়ে এলো কণ্ঠে / মন্দার মালিকা
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত / জ্যোতির্ময় টিকা
মলিন ললাটে॥ (৮+৬, ৮+৬, ৬)

শোষণ শক্তি : বাংলায় সমমাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এদের উভয়েরই চলন—খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপ আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন এর মাত্রাগুলোকে অনেকটা ইচ্ছামত চলাচলি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলে এর শোষণ শক্তির কথা উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অযুক্তাক্ষরের জায়গায় বসালেও ছন্দ পতন ঘটবে না, কারণ পয়ারে যে ফাঁক থাকে সেই ফাঁকের মধ্যে যুক্তাক্ষরকে শোষণ করে নেবার ক্ষমতা পয়ারের রয়েছে—

৮ ৬

পাষাণ মিলায়ে যায় / গায়ের বাতাসে

এই চরণে যুক্তাক্ষর নেই, যুক্তাক্ষরের ওজন ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে দিয়েও পয়ারের কৌলিন্যকে বজায় রাখা যেতে পারে—

৮ ৬

পাষাণ মুর্ছিয়া যায় / গায়ের বাতাসে

যুক্তাক্ষর আরও বাড়ানো হ'ল—

পাষাণ মুর্ছিয়া যায় / অঙ্গের বাতাসে

আরও ওজন বাড়ানো হ'ল—

৮ ৬

পাষাণ মুর্চ্ছিয়া যায় / অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

আরও ওজন চাপান হ'ল—

৮ ৬

সংগীত তরঙ্গি উঠে / অঙ্গের উচ্ছ্বাসে

আবও ভার চাপান হ'ল—

৮ ৬

সংগীত তবঙ্গ রঙ্গ / অঙ্গের উচ্ছ্বাস

আবও ওজন বাড়ানো হ'ল—

৮ ৬

"দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য পূর্ণ / দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত"

ববীন্দ্রনাথ শুধু পয়ারের ক্ষেত্রে শোষণশক্তির কথা বলে ক্ষান্ত হননি, তিনি মাত্রামূলক ছন্দেও অনুরূপ শোষণশক্তির কথা বলেছেন—"সেকালে অক্ষর গুণতি করা তিনমাত্রামূলক ছন্দে যুক্তধ্বনি বর্জন করে চলতুম। কিন্তু তাতে রচনায় অতিলালিত্যের দুর্বলতা এসে পৌঁছত সেটা যখন আমার কাছে বিরক্তিকর হ'ল তখন যুক্তধ্বনির স্মরণ নিলুম। ছন্দটা একদিন ছিল যেন নবনী দিয়ে গড়া—

"বরষার রাতে জলের আঘাতে
পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া
পবিমলে তারি সজল পবন
করুণায় উঠে ভরিয়া ॥"

এই দুর্বলতা মধ্যে যুক্তবর্ণ এসে দেখা দিল—

"নববর্ষার বারি সংঘাতে
পড়ে মল্লিকা ঝবিয়া
সিক্তপবন সুগন্ধে তারি
কারুণ্যে উঠে ভরিয়া"

তিনি আরও উদাহরণ দিয়েছেন তিন মাত্রার ছন্দের—

"আঁখির / পাতায় / নিবিড় / কাজল
গলিছে / নয়ন / সলিলে"

যুক্তাক্ষব বসিয়ে—

'চক্ষুর / পল্লবে / নিবিড় / কজ্জল
গলিছে / অশ্রুর / নির্ঝরে।"

৮ ১০
"শ্রাবণের কালো ছায়া / নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্‌-ললনার / গলিত কাজল-বরিষণে।"

যুক্তাক্ষর বর্জিত এই মহাপয়ারকেও যুক্তাক্ষর দিয়ে সাজালে ছন্দ পতন ঘটবে না—

"বর্ষার তমিস্রচ্ছায়া / ব্যাপ্ত হল অরণ্যের তলে
যেন অশ্রুসিক্ত চক্ষু / দিগ্‌বধূর গলিত কজ্জলে।"

মধ্যযুগে দেখতে পাই পয়ারে ব্যবহার প্রধানতঃ হয়েছে আখ্যানে, রামায়ণ-মহাভারত মঙ্গল কাব্যে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতিতে এবং তিন মাত্রামূলক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে গীতি-কবিতায়।

ত্রিপদী

লঘু ত্রিপদী : এই ছন্দে প্রতি চরণে তিনটি পর্ব থাকে। প্রথম দুই পর্বের পদান্তে অন্ত্যানুপ্রাস থাকে এবং সেই অনুপ্রাস ব মিল দেখানোর জন্য পর্ব দুটোকে আলাদা ভাবে বসিয়ে দেখানো হয়।

৬ ৬
"কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
৮
ঘষিতে সৌরভময়"

এক আধ তিলে মোরে না দেখিলে
যুগ-শত হেন বাসে ৬+৬+৮

দীর্ঘ ত্রিপদী : লঘু ত্রিপদীর মতই তবে এতে মাত্রা সংখ্যা বেশি—

৮ ৮
তুমি আজ কোথা গিয়া আমি আছি শূন্য হিয়া
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা

এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহ কোণে
দেবতার তরে থাক্‌ পুষ্প-অর্ঘ্যভার। ৮+৮+১৪

লঘু চৌপদী : এই ছন্দের প্রতি চরণে চারটি করে পর্ব থাকে, প্রথম তিনটি পর্বের শেষে মিল থাকে। প্রতি দুই চরণের শেষেও মিল থাকে। দুই চরণে একটি স্তবক গঠিত হয়। এর সাধারণ মাত্রা সংখ্যা ৬+৬+৬+৫—

৬	৬
চির সুখীজন	ভ্রমে কি কখন
৬	৫
ব্যথিত বেদনা	বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে	বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে	দংশেনি যারে।

দীর্ঘ চৌপদী : লঘু চোপদীর মতোই তবে মাত্রা সংখ্যা— ৮+৮+৮+৬ ; ৮+৮+৮+৭ ; ৮+৮+৮+১০ হতে পারে—

ক্রমে ক্রমে আঁখিজল
ভিজায় কপোলতল
দুই ফোঁটা অশ্রুজল
শঙ্কায় বাতাসে। ৮+৮+৮+৬

অমিত্রাক্ষর ছন্দ : মাইকেল মধুসূদন ইংরাজ কবি মিলটনের আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্য রচনা করেন। এই ছন্দ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—
"If well recited, it sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose, retaining at the same time a sweet musical impression".

অমিত্রাক্ষরে বৈশিষ্ট্য : (ক) এই ছন্দে অর্থ বিভাগ ও ছন্দোবিভাগ পরস্পর মিলে যায় না অর্থাৎ 'যতি' ছেদের অনুগামী নয়।

(খ) সাধারণ কবিতায় দেখা যায়—যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে। অবশ্য মাঝে মাঝে উপচ্ছেদ ও অর্ধযতি ঠিক মেলে না।

(গ) অপর ছন্দে রচিত কবিতায় দেখা যায়—ছন্দের আদর্শ অনুসারে—পরিমিত মাত্রার পর যতি পড়ে।

(ঘ) এই ছন্দে কয় মাত্রার পর যতি পড়বে তার বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই।

(ঙ) এই ছন্দ বেগমান্ এবং আবেগময়। আবেগের প্রয়োজনানুসারে যতি পড়ে, কখনো দ্রুত বা কখনো বিলম্বে পড়ে। তাই এই ছন্দকে 'অমিত্রাক্ষর' এবং অন্য ছন্দকে 'মিত্রাক্ষর' বলা যেতে পারে।

(চ) যতির অবস্থানের দিক্ থেকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় যে এই ছন্দ পয়ারের অনুরূপ। অর্থাৎ 'চোদ্দ মাত্রার' প্রতি চরণের শেষে পূর্ণযতি এবং চরণের প্রথম 'আট মাত্রার' পর অর্ধযতি পড়ে।

(ছ) পর্বের মধ্যে কোনো পর্বাঙ্গের পর ছেদ দেখতে পাওয়া যায়।

(জ) একটি চরণের মধ্যে অর্থ বিভাগ সম্পূর্ণ হয় না, অপর চরণের সঙ্গে মিলে অর্থ বিভাগ হয়।

(ঝ) পূর্ণচ্ছেদ এবং উপচ্ছেদ বসানোর বৈচিত্র্যের ফলে এই ছন্দ অর্থ বিভাগের দিক দিয়ে বিচিত্রভাবে বিভক্ত হয়ে থাকে।

মধুসূদন "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" সর্বপ্রথম এই ছন্দ প্রয়োগ করেন। কিন্তু সেখানে ছন্দ পতন ঘটেছে বহুবার উপরন্তু ভাষার মধ্যেও জড়তা ছিল। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে এই ছন্দ নিরঙ্কুশ বলা চলে না মাঝে মাঝে ছন্দ পতন ঘটেছে কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যে এই ছন্দ একেবারে ত্রুটিহীন। মেঘনাদবধ কাব্য থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

৮ ৬

একাকিনী শোকাকুলা / অশোক কাননে ॥
কাঁদে রাঘব বাঞ্ছা / আঁধার কুটীরে ॥
নীরবে * * দুরন্ত চেড়ী / সীতারে ছাড়িয়া ॥
ফেরে দূরে * মত্ত সবে / উৎসব কৌতুকে। * *
(* উপচ্ছেদ ; * * পূর্ণচ্ছেদ, /= অর্ধযতি ; ॥= পূর্ণযতি)

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি নবীনচন্দ্র সেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করেছেন ; কিন্তু তাঁদের ছন্দে মধুসূদনের ছন্দের গাম্ভীর্য ও ধ্বনি প্রবাহ রক্ষিত হয়নি। বহুলাংশে তরল হয়ে পড়েছে—

চাহিয়া সহাস্য চিত্তে / পুত্রের বদনে ॥
কহিলা দণুজেশ্বর / বৃত্রাসুর হাসি, ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবীনচন্দ্র পর্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ না বসিয়ে অর্ধযতিতে পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের সেই গাম্ভীর্য ও ধ্বনি প্রবাহের অভাব দেখতে পাই—

দূর হোক ইতিহাস ! × × দেখ একবার ॥
মানব হৃদয় রাজ্য / × × দেখ নিরন্তর ॥
বহিতেছে কি ঝটিকা / × ×

মধুসূদন রচনা করেছিলেন—"অমিল অমিত্রাক্ষর" ছন্দে ; রবীন্দ্রনাথ সেই অমিল-অমিত্রাক্ষর ছন্দকে "সমিল-অমিত্রাক্ষর" করেছেন উপরন্তু পর্বের মাত্রা-পদ্ধতিতে মধুসূদনকে অনুসরণ না করে নোতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন—

৮ ৬
গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা / রটি গেল ক্রমে × ॥

৮ ৬
মৈত্র মহাশয় যাবে / সাগর সঙ্গমে ॥

৬ ৮
তীর্থস্নান লাগি । × × / সঙ্গীদল গেল জুটি ॥

১০ ৪
কত বালবৃদ্ধ-নরনারী × × / নৌকা দুটি ॥

প্রস্তুত হইল ঘাটে । × ×

রবীন্দ্রনাথ "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায়—৮+৬ ; ৬+৮ না করে—৮+১০ ; ১০+৮ করেছেন—

৮ ১০
হে আদি জননী সিন্ধু / * বসুন্ধরা সন্তান তোমার ॥ *

১০ ৮
একমাত্র কন্যা তব কোলে / * * তাই * তন্দ্রা নাহি আর ॥

১০
চক্ষে তব * তাই বক্ষ জুড়ি / * সদা শংক, সদা আশা ॥

৬
সদা আন্দোলন ; * *

"স্বর্গ হতে বিদায়" কবিতায় আর এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন—পর্বের মাত্রাতে—

স্বর্গ তব / রহুক অমৃত ॥ ৪ / ৬

মর্তে থাক সুখে দুঃখে / অনন্ত মিশ্রিত ॥ ৮+৬

প্রেমধারা অশ্রুজলে / চিরশ্যাম করি ॥ ৮+৬

ভূতলের স্বর্গখণ্ড / গুলি / হে অপ্সরি ॥ ৮/২/৪

প্রমথ চৌধুরী সনেট রচনায় অনেক সময় ৮/২/৪=১৪ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলাকায় যে অসম ছন্দ ব্যবহার করেছেন—তার মধ্যেও অমিত্রাক্ষর রীতির স্পর্শ রয়েছে এবং এতে মিত্রাক্ষর রীতিরও স্পর্শ রয়েছে। সেজন্য একে সমিল-

অমিল ছন্দ বলাই বাঞ্ছনীয়। মিত্রাক্ষরের অবস্থান বোঝাবার জন্য কবি যেন পয়ারের পর্বগুলোকে ভেঙে সাজিয়ে দিয়েছেন। ফলে এই হয়েছে যে—পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যানুপ্রাস থাকলেও প্রতি পঙ্‌ক্তিতে সমমাত্রার অক্ষর সংখ্যা নেই। বলাকার পঙ্‌ক্তিগুলো প্রায়ই অসম্পূর্ণ—এই অসম্পূর্ণতাই হচ্ছে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছেদ ও যতির দিক থেকে এই ছন্দ সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত। পূর্ণচ্ছেদ বা অর্ধচ্ছেদ কত মাত্রার পর থাকবে তার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

বলাকায় ছন্দাতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতিরিক্ত শব্দগুলো প্রধান অক্ষরগুলোর সঙ্গে এমনিভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে তাদের হঠাৎ চেনার উপায় নেই।

বলাকা গতির কাব্য। এর ছন্দেও একটা গতি রয়েছে— যে গতি ভাবের গতি। ভাবের সঙ্গে কথাগুলো জড়িয়ে পড়ে একটা অভিনবত্ব দান করেছে—

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।

যতি ও ছেদ বিচার করে অমূল্যধন এর ছন্দোলিপি করেছেন—

"হে ভুবন * আমি যতক্ষণ / * তোমারে না ॥
বেসেছিনু ভালো / * * ততক্ষণ * তব আলো ॥ *
খুঁজে খুঁজে পায নাই / * তার সব ধন ॥ * *

বলাকায় আরও এক ধরণের ছন্দ রয়েছে। এই কবিতার ছন্দোলিপি করার সময় দেখতে পাওয়া যায়—পর্বের আগে কখনো কখনো ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ রয়েছে। এই অতিরিক্ত শব্দকে ছন্দোলিপির হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে—

হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা * 0+১০
যেন শূন্য দিগন্তের / ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা * ৮+১০
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্ * * 0+১০
(শুধু থাক) এক বিন্দু নয়নের জল 0+১০
কালের কপোল-তলে / শুভ্র সমুজ্জ্বল * ৮+৬
এ তাজমহল × × 0+৬

"শুধু থাক" অতিরিক্ত শব্দ গুচ্ছ বলে ছন্দোলিপি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই

কবিতাতে কখনো একটি পর্ব আবার কখনো দুটি পর্ব রয়েছে। যেখানে দুটো পর্ব নেই সেখানে "০" চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়েছে।

গৈরিশ ছন্দ ঃ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের পদ্যাংশে যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন—তাও অমিত্রাক্ষর ছন্দের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট। তবে এই ছন্দের আদিরূপ পাই নাট্যকার ব্রজমোহন রায়ের "দানব বিজয়" নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের "নিভৃত নিবাস" কাব্যে। তবে গিরিশ চন্দ্রের হাতে এই ছন্দ একটা সুষ্ঠ রূপ লাভ করে। গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত ছন্দকে অমূল্যধন বলেছেন—Free Verse বা মুক্তক ছন্দ। মূলতঃ এ ছন্দ হচ্ছে "ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ"।

রাজকৃষ্ণ রায় "পদ্য পঙ্‌ক্তি গদ্য" অর্থাৎ 'গদ্যকবিতা'ও লিখেছেন—

"সাধের ফুল। ভিজে গেছিস্ ?
তোর নধর অধরে ও টল্‌টল্ কোচ্চে ?—
সুধা ? মধু ?
না, ও যে মেঘের জলবিন্দু।" (বর্ষা। গোলাপ)

গিরিশ প্রবর্তিত ছন্দের পর্ব সংখ্যা সমান নয় এবং তার দৈর্ঘ্যও সমান নয়। ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য গিরিশচন্দ্র অনুরূপ ভাবে পর্ব রচনা করেছেন—

অভাগিনী তুমি।	০+৬
পতি ভাগ্যে / ভাগ্যবতি নারী * *	৪+৬
খুঁজে দেখ * / এ তিন ভুবন * *	৬ / ৪
কেবা আছে * / ভাগ্যবান মম সম।	৪ / ৮

চতুর্দ্দশপদী কবিতা ঃ ইংরাজী Sonnet কে মধুসূদনই সর্ব প্রথম 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা' নাম দিয়ে ইতালীয় ছন্দকে বাংলার মাটিতে প্রতি-রোপণ করেন। Sonnet বস্তুটি বিলাতী, কিন্তু চোদ্দ-পদে'র কবিতার জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশেই। তবে মধুসূদন ঐ "চতুর্দ্দশপদী" কবিতাকে বিলাতী অলঙ্কারে সাজিয়ে একটা নোতুন রূপ দিয়েছেন। 'সনেট' রচনাতেও মধুসূদন পয়ারের পর্ব ও মাত্রা ভাগ (৮+৬) কেই মেনে নিয়েছেন এবং পয়ারের পদান্তের অনুপ্রাসকে অন্যভাবে সাজিয়েছেন—

একথা ঠিক, মধুসূদন যখন ভার্সাই নগরীতে বাস করছিলেন তখনই ইতালীয় ভাষায় রচিত সনেট পড়ে সনেট রচনার প্রেরণা অনুভব করেন। এবং

মনমোহন ঘোষকে বলেন—"In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our Sonnet in time would rival the Italian."

অনেক সমালোচক বলেন যে একাদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ কবি "গিদো আরেৎসওই (Giudo D' Arezzo) প্রথম সনেট রচনা করেন। মহাকবি দান্তেও সনেট রচনা করেছেন কিন্তু সনেট রচনায় সার্থকতা লাভ করেছেন—ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালীয় কবি পেত্রার্কা। পরবর্তী কালে ওয়াটস, সারে, সেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কীট্স, রসেটি প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিরা সার্থক সনেট রচনা করেছেন।

ইতালীয় সনেট : এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

(ক) চোদ্দটি পঙ্‌ক্তি থাকবে এবং এর দুটো ভাগ- ৮+৬।

(খ) প্রথম আট পঙ্‌ক্তির মিল হচ্ছে—ক, খ, খ, ক অর্থাৎ প্রথম ও চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তির শেষে মিল থাকবে।

(গ) দ্বিতীয় ছয় পঙক্তির মিলের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে—দুটো বা তিনটে মিল থাকতে পারে—গঘ গঘ গঘ অথবা গঘঙ, গঘঙ অথবা গঘঘ, গঘঘ।

(ঘ) শেষ দুটো পঙ্‌ক্তিতে কখনই এক মিল থাকবে না।

সনেটের প্রথম আট চরণকে অষ্টপদী বা অষ্টক (Octave) এবং শেষের ছয়টি চরণকে ষট্‌পদী বা ষড়ক (Sestet) বলা হয়। প্রথম আট পঙ্‌ক্তির মধ্যে দুটো ভাগ থাকে ৪+৪, প্রতিটি ভাগকে বলা হয়—Quatrain এবং শেষ ছয় পঙ্‌ক্তির মধ্যে দুটো ভাগ থাকে ৩+৩। এর প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয় terect।

সেক্‌সপীরীয় সনেট : সেক্‌সপীয়র পেত্রার্কার রীতি অবলম্বন করেননি। তাঁর গঠন প্রণালী পৃথক। তিনি 'অষ্টক' ও 'ষষ্টক' ভাগ রক্ষা করেননি—তাঁর মিল হচ্ছে—কখ, কখ, গঘ, গঘ, চছ, চছ, ঞঞ।

মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্‌স প্রভৃতি কবিরা বহুলাংশে পেত্রার্কাকে অনুসরণ করেছেন।

মধুসূদন পেত্রার্কা ও সেকস্‌পীয়র উভয়কেই অনুসরণ করেছেন—

"কমলে কামিনী আমি / হেরিনু স্বপনে (৮+৬) ক
কালিদহে। বসি বামা / শতদল-দলে— খ
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা / সরসীর জলে খ
মনোহর।) বাস করে / সাপটি হেলনে ক
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে ক
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে খ
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে। খ
কার না ভোলেরে মনঃ, এহেন ছলনে" ক

(পেত্রার্কা রীতিতে রচিত।)

"চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি ক
জাহ্নবী ; ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন, খ
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা যেমতি ক
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন খ

(সেক্সপীরীয় রীতি)

মধুসূদন পয়ারের চরণ নিয়ে সনেট রচনা করলেও ছন্দের প্রবাহে অনেক সময়েই অমিত্রাক্ষরের ভাব-রূপ দেখা দেয়—বিশেষতঃ যতি ছন্দের ব্যবহারে।

মধুসূদনের পর দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ কবিরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সনেট রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ৮+৬ পরিহার করে অনেক সময় ৮+১০ করেও সনেট রচনা করেছেন—

৮ ৬

"নিশিদিন কাঁদি সখি / মিলনের তরে— ক
যে মিলন ক্ষুধাতুর / মৃত্যুর মতন। ৮+৬
লও লও বেঁধে লও / কেড়ে লও মোরে— ক
লও লজ্জা লও বস্ত্র / লও আবরণ খ

আবার— ৮+১০

কোথা রাত্রি, কোথা দিন / কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা ক
কেবা আসে কেবা যায় / কোথা বসে জীবনের মেলা খ
কেবা হাসে কেবা গায়, / কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা খ
কোথা পথ, কোথা গৃহ / কোথা পান্থ, কোথা পথ হারা খ

(চিরদিন / কড়ি ও কোমল)

একে অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ারও বলা হয়।

অক্ষরবৃত্ত পয়ার : ৮+৬=১৪

জন্মেছি যে মর্ত্য কোলে / তাকে ঘৃণা করে
ছুটিব না স্বর্গ আর / মুক্তি খুঁজিবারে।

অক্ষরবৃত্ত একপদী :

ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

স্বরবৃত্ত

স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত (Syllabic Style) ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "প্রাকৃত বাংলার ছন্দ', এবং অমূল্যধন বলেছেন "শ্বাসাঘাত" প্রধান ছন্দ। এই ছন্দ "ছড়ার ছন্দ" নামে সমধিক প্রচলিত।

ছড়া, পাঁচালি, লোকগীতির মধ্যেই এই ছন্দ মূলতঃ আবদ্ধ ছিল—

"চান করে যেবা নারী খায় গুয়া পান
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান ॥

সকাল বেলা ছড়া দেয় সন্ধ্যা হলে বাতি
লক্ষ্মী বলে সেই ঘরে আমার বসতি ॥

শিরে ছিল আর বাঁশিটী তুল্যা নিল হাতে
ঠার দিয়া বাজাইল বাঁশী মহুয়ারে আনিতে।

যেনা নাচন, যেনা
বট্ পুকুরের কেনা।

এই ছড়া ও গীতিকাগুলো রচিত হয়েছে অ-সাধু ভাষায়। অ-সাধু ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাংলার সাধু ভাষাটা খুব জড়ালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অ-সাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া অ-সাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। যে আউলের মুখে বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া যে ভদ্র সাহিত্য সভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই। সেই সব মেঠো গানের ঝরণা তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত শব্দগুলো নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুনঠুন শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য পল্লীর গণ্ডীর দিঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই; সেখানে হসন্ত ঝংকার বন্ধ।"

ছড়ার ছন্দে কবিতা আগে রচিত হয়েছে (পূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে); কিন্তু একে সাহিত্যের আম-দরবারে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ। এই ছন্দে বহু কবিতা কাব্য তিনি রচনা করেছেন। এই চলতি ভাষার স্রোতে যে কলধ্বনি

রয়েছে তা কবি চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। চল্‌তি ভাষার হসন্ত সুরে তিনি বলেছেন—

আমার্‌ সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুট্‌বে গো ফুল্‌ ফুট্‌বে।
আমার্‌ সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ্‌ হয়ে উঠ্‌বে।

চল্‌তি ভাষায় রচিত এই পঙ্‌ক্তিগুলোকে যদি "সাধু ভাষার ছন্দ" এ লেখা যায়, তাহলে তার যে চেহারা দেখা দেবে তা কবি নিজে লিখে দেখিয়েছেন—

"যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে।"

আবার যুক্তবর্ণকে যদি একমাত্রা করে ধরে একে লেখা যায় তাহলে এর চেহারা হবে—

"সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম স্তবক ফুটিবে,
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্তি ধরি গোলাপ হইয়া ফুটিবে।"

চলতি ভাষার এই ছন্দ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন—"সংস্কৃত ভাষার জরিজহরতের ঝালর-ওয়ালা দেড়হাত দুইহাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষা বধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি তাহাতে সাধু-লোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশি, সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্য পাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।"

এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

(ক) প্রতিটি পর্বের গোড়ায় একটি করে শ্বাসাঘাত বা Stress পড়বে।

(খ) এই শ্বাসাঘাতের ফলে পর্বের অক্ষরে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ সংকুচিত হয়ে একমাত্রার হবে।

(গ) এর প্রতি পর্বে ৪ মাত্রা এবং ২ মাত্রা করে পর্বাঙ্গ থাকে। সাধারণতঃ প্রতিটি চরণে ৪টি পর্ব থাকবে এবং শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাক্‌বে। তবে রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদকে সম্পূর্ণ মেনে নেননি। তিনি এই ছন্দে ২, ৩, ৪, ৫ পর্বের চরণেরও কবিতা রচনা করে বৈচিত্র্য এনেছেন।

(ঘ) এই ছন্দে প্রায় প্রত্যেক পর্বেই যুগ্মধ্বনি ব্যবহার হয়; অবশ্য ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

(ঙ) এই ছন্দে পয়ারের মত ধ্বনি প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায় না।

(চ) শ্বাসাঘাত থাকায় এর লয় হয়েছে—দ্রুত।

(ছ) বাংলা ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এই ছন্দে বিশেষ ভাবে বিধৃত হয়ে নৃত্যচপল করে তুলেছে।

(জ) এই ছন্দ স্বরধ্বনির পরিমিত সংখ্যার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।

(ঝ) এই ছন্দ নদী-মাতৃক বাংলা দেশের ঘরোয়া ছন্দ।

(ঞ) প্রাচীন কালে একে "ধামালী"ও বলা হয়েছে। তখন পর্বের মাত্রা ৪ অক্ষরে সীমাবদ্ধ ছিল না, উচ্চারণের সময়ে প্রয়োজন মত ধ্বনি বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেওয়া হত—বাঙালি মেয়েদের খোঁপার মতো।

(ট) সংবৃত ও বিবৃত (Open and Closed Syllable) প্রতিটি ১ মাত্রা ওজনের।

(ঠ) স্বরবৃত্ত-রীতিতে দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী, পয়ার রচিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্তেও 'মুক্তক' পদ রচনা করেছেন।

(ড) শ্বাসাঘাত থাকায় যৌগিক অক্ষর হ্রস্ব বলে পরিগণিত হয়েছে

পয়ার (লঘু)

খাঁচার ভিতর্ / অচিন্ পাখী // কেম্নে আসে / যায়
ধর্তে পার্লে / মনবেড়ী / দিতাম্ তাহার্ / পায়।

৪+৪+৪+২

৪ ৪ ৪ ৪
রেবার্ তটে / চাঁপার্ তলে / সভা বস্ত / সন্ধ্যা হলে=১৬

৪ ৪ ৪ ২
আজ্ বিকালে / কোকিল্ ডাকে / শুনে মনে / লাগে=১৪

এটাকে আবার—

৮ ৬
আজ্ বিকালে কোকি্ল ডাকে / শুনে মনে লাগে
বাংলা দেশে ছিলাম্ যেন / তিন্ শো বছর্ আগে"

করা যেতে পারে। (স্বরবৃত্ত দ্বিপদী)

স্বরবৃত্ত একপদী (১০ মাত্রার)

কাঁকন-জোড়া / এনে দিলেম্ / যবে। ৪+৪+২=১০
ভেবেছিলাম্ / হয়তো খুশি / হবে।

স্বরবৃত্ত চৌপদী :

দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে= ৮
ছায়ার্ মতো চরণ্-দেশে= ৮
কঠিন্ তব নূপুর ঘেঁসে= ৮
আর্ বসে না / রইব= ৪+২=৬

স্বরবৃত্ত মহাপয়ার :

৪ ৪ ৪ ৪ ২
যারা আমার্ / সাঁঝ-সকালের্ / গানের দীপে / জ্বালিয়ে দিলে / আলো
আপন্ হিয়ার / পরশ্ দিয়ে / এই জীবনের্ / সকল্ সাদা / কালো
(পূরবী / রবীন্দ্রনাথ) — ১৮ মাত্রা।

অসম পর্ব :

আমি যদি / জন্ম নিতেম্ / কালিদাসের / কালে। ৪+৪+৪+২
এক্‌টি শ্লোকে / স্তুতি গেয়ে= ৪+৪
রাজার্ কাছে / নিতাম্ চেয়ে= ৪+৪
উজ্জয়িনীর বিজন্ প্রান্তে / কানন্-ঘেরা বাড়ি= ৪+৪+৪+২

স্বরবৃত্ত মুক্তক :

মা কেঁদে কয় / মঞ্জলী মোর্ / ঐ তো কচি / মেয়ে
ওরি সঙ্গে / বিয়ে দেবে / বয়সে ওর্ / চেয়ে
পাচ্‌গুণো যে / বড়
তাকে দেখে / বাছা আমার্ / ভয়েই জড় / সড়।
পলাতকা / রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ ৪ মাত্রার পর্বকে ভেঙে ৩ মাত্রাব করে করেছেন—
কৃষ্ণ কলি / আমি তারেই বলি= ৪ / ৪ / ২
অমূল্যধন / আনন্দ মোহন।

রবীন্দ্রনাথ করেছেন -
কৃষ্ণে / কলি- / আমি / তারেই / বলি- =৩+৩+৩+৩+৩

অথবা

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর্‌টুপর্ / নদেয় এল / বান্
শিব্ ঠাকুরেব / বিয়ে হল / তিন কন্যে / দান্ =৪+৪+৪+২

রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন ৩ মাত্রার ছন্দ (অমূল্যধনের মতে ৪ মাত্রার)

বৃষ্টি / পড়ে- / টাপুর / টপুর / নদেয় / এল- / বা-ন

শিবঠা / কুরের / বিয়ে- হবে- / তিনক / ন্যে- / দা-ন।

তাঁর মত হচ্ছে তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলো সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো যায়গা দখল করে নিয়েছে।

মুক্তক :

মা কেঁদে কয় / মঞ্জলী মোর / ঐ তো কচি / মেয়ে

ওরি সঙ্গে / বিয়ে দেবে / বয়সে ওর / চেয়ে

পাঁচগুণো যে / বড়

তাকে দেখে / বাছা আমার / ভয়েই জড় / সড়

পলাতকা / রবীন্দ্রনাথ

মাত্রাবৃত্ত

'মাত্রাবৃত্ত' বিলম্বিত লয়ের ছন্দ। অমূল্যধন এর নাম দিয়েছেন—ধ্বনি প্রধান ছন্দ; রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন—"সংস্কৃত ভাষা" ছন্দ এবং প্রবোধচন্দ্র এর নাম দিয়েছেন—'কলাবৃত্ত' (moric style) 'মাত্রাবৃত্ত' নামটি আগে প্রবোধচন্দ্র দিয়েছিলেন।

এই ছন্দের দুটো রূপ—(১) প্রাচীন রূপ (২) আধুনিক রূপ। প্রাচীন রূপটির সূত্র হয়েছে চর্য্যাপদ থেকে এবং এর শেষ সীমা রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' গ্রন্থের পূর্ব পর্যন্ত। এই ছন্দের আধুনিক রূপটি রবীন্দ্রনাথের দান।

আনন্দমোহন বলেছেন, যে রীতিতে মুক্তদল (স্বরান্ত সিলেবেল) মাত্রই একমাত্রার এবং স্বরান্ত ও হলন্তরুদ্ধ দল সব সময়ে সম্প্রসারিত ও দুই মাত্রার বলে গণ্য হয় তাকে "নব্যকলাবৃত্ত" রীতি বলা হয়। আর যে ক্ষেত্রে উক্ত লক্ষণ ছাড়াও দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক মর্য্যাদা পায় তাকে "প্রাচীন বা প্রত্নকলাবৃত্ত" বলে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রচিত ভারতচন্দ্রের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন'—গানে এ বিশুদ্ধ বা শিষ্টরূপ এবং চর্য্যাগীতি, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি পদকর্তাদের ব্রজবুলি গীতিগুলোতে এর শিথিল রূপ দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ প্রত্নকলাবৃত্ত ছন্দকে বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য ছন্দ বলে, বলেছেন— 'বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানতঃ প্রকাশ পেয়েছে।"

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষায় দুটো ধারা—ব্রজবুলি এবং বাংলা। ছন্দের ক্ষেত্রেও মোটামুটি বলা যেতে পারে যে—দুটো ধারাই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে—(১) মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত) এবং (২) অক্ষরবৃত্ত (মিশ্রকলাবৃত্ত)। এই দুটো ধারা দু'জন দিক্‌পাল—বিদ্যাপতি (মাত্রাবৃত্ত) এবং বড়ু চণ্ডীদাস (অক্ষরবৃত্ত)।

মাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য :

১) প্রতিটি অক্ষরধ্বনি, এই ছন্দে, বিশেষ ভাবে প্রাধান্য লাভ করে। পয়ারের অক্ষর-ধ্বনির অতিরিক্ত টান এই ছন্দে নেই।
২) বিলম্বিত লয়ে ছন্দ ব'লে যৌগিক অক্ষর ২ মাত্রার (দীর্ঘ) অন্য অক্ষর ১ মাত্রার (হ্রস্ব) তবে ব্যতীক্রমও আছে।
৩) সময় বিশেষে মৌলিকস্বর ২ মাত্রার হতে পারে।
৪) যুক্ত ব্যঞ্জনের আগের স্বরটি ২ মাত্রার।
৫) হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের স্বর দীর্ঘ।
৬) 'ং' ও 'ঃ' এর পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ।
৭) ঐ, ঔ দীর্ঘস্বর। অন্যান্য স্বর সাধারণতঃ ১ মাত্রার।
৮) এই ছন্দে সাধারণতঃ দু'ধরনের পর্ব থাকে—'বিশেষ পর্ব' ও 'সাধারণ পর্ব'। বিশেষ পর্ব হচ্ছে—যুক্তাক্ষর দিয়ে গঠিত ছোট ছোট পর্ব এবং সাধারণ পর্ব হচ্ছে বর্ণদ্বারা গঠিত দীর্ঘ পর্ব।
৯) এই ছন্দ একান্তভাবেই গীতি ধর্মী।
১০) এই ছন্দের শোষণ শক্তি নেই ; যা অক্ষরবৃত্তে রয়েছে।
১১) বিলম্বিত লয়ের ছন্দ ব'লে আরাম-প্রিয়তা ও আরাম বিমুখতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। সেই জন্য যৌগিক অক্ষরের পুরো দাম দেওয়া হয়।
১২) এই ছন্দে শ্বাসবায়ুর পরিমাণের সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে হয়।
১৩) দুর্বল ছন্দ ব'লে বেশি মাত্রার পর্ব ব্যবহার করা চলে না।

মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের মধ্যে পার্থক্য

১) মাত্রাবৃত্ত ধ্বনি প্রধান, অক্ষরবৃত্ত তান প্রধান।
২) মাত্রাবৃত্ত বিলম্বিত লয়ের ছন্দ, অক্ষরবৃত্ত ধীর লয়ের ছন্দ।
৩) অক্ষরবৃত্তে যুগ্ম ধ্বনি প্রায়ই হ্রস্ব এবং এক মাত্রার ; মাত্রাবৃত্তে যুগ্ম ধ্বনি সাধারণতঃ দীর্ঘ এবং দুই মাত্রার।

৪) মাত্রাবৃত্তে অক্ষরের ধ্বনি "পরিমাণ প্রাধান্য" এবং অক্ষরবৃত্তে ধ্বনির উপর "তানের প্রবাহ" বিস্তার লাভ করে।

৫) অক্ষরবৃত্তের (পয়ার) শোষণ শক্তি আছে, মাত্রাবৃত্তে তা নেই।

৬) অক্ষরবৃত্তে ধ্বনির গাম্ভীর্য রয়েছে, কিন্তু মাত্রাবৃত্তের ধ্বনির গাম্ভীর্য নেই, আছে চাঞ্চল্য ও মাধুর্য। "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে" থেকে "দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত" একই ওজনের। মাত্রাবৃত্ত "মেয়েলি ছন্দ" অক্ষরবৃত্ত "পুরুষালি ছন্দ"।

৭) অক্ষরবৃত্তে সাধারণতঃ অসমমাত্রার পূর্ণ পর্ব থাকে না, কিন্তু মাত্রাবৃত্তে—৫, ৭ অসম মাত্রার পূর্ণ পর্ব পাওয়া যায়।

৮) অক্ষরবৃত্ত সাধারণতঃ 'ং' ও 'ঃ' এর মাত্রা গণনা করা হয় না, কিন্তু মাত্রাবৃত্তে করা হয়।

৯) ছন্দের প্রয়োজনবোধে অক্ষরের দীর্ঘীকরণ উভয়জাতীয় ছন্দে চলে, তবে মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘীকরণ অপেক্ষাকৃত বেশি।

স্বরবৃত্তের সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের ও অক্ষরবৃত্তের পার্থক্য

১) স্বরবৃত্ত দ্রুত লয়ের, মাত্রাবৃত্ত বিলম্বিত লয়ের এবং অক্ষরবৃত্ত ধীর লয়ের ছন্দ।

২) স্বরবৃত্ত শ্বাসাঘাত প্রধান, মাত্রাবৃত্ত ধ্বনি প্রধান এবং অক্ষরবৃত্ত তান প্রধান ছন্দ।

৩) স্বরবৃত্তে প্রায় প্রতিটি পর্বে একটা প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তে তা নেই।

৪) অমূল্যধন এবং প্রবোধচন্দ্রের মতে এই ছন্দে ব্যবহৃত পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তিনমাত্রার পর্বকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তে এধরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, রবীন্দ্রনাথ ২,৩,৪ পর্বের চরণেও এই ছন্দ রচনা করেছেন।

৫) শ্বাসাঘাত থাকার ফলে যৌগিক অক্ষর হ্রস্ব হয়ে পড়েছে, তবে প্রয়োজনে দীর্ঘও করা হয়।

৬) এই ছন্দের মাত্রাবৃত্তের মতো শোষণ শক্তি নেই, যা অক্ষরবৃত্তে রয়েছে।

সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের পার্থক্য

১) সংস্কৃত-উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্ছে তার ধ্বনির দীর্ঘ-হ্রস্বতা। তাদের 'মাত্রা' পূর্ব নির্দিষ্ট কিন্তু বাংলা-উচ্চারণে ঐ বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

২) সংস্কৃত ছন্দ কেবল মাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ।

৩) বাংলা ছন্দের মধ্যে সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনির অভাব দেখতে পাই। বাংলা গীতমূলক ছন্দ। গীত-সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়। কথার যে অভাব, সুর সেই অভাবকে পূর্ণ করে দেয়—সংস্কৃতে এর বিপরীত দেখি। সংস্কৃতে গীতি কবিতা নেই বললেই চলে—একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গীতি কবিতা হচ্ছে— জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

৪) সংস্কৃতের "যতিবিচ্ছেদঃ" বাংলার "বিচ্ছেদযতি" বা ছেদ একই প্রকার। কিন্তু বাংলায় আর এক ধরণের 'যতি' (উপচ্ছেদ) আছে তা সংস্কৃতে নেই। অর্থাৎ বাংলায় breath pause (বিচ্ছেদযতি), Metrical pause (বিরামযতি) এ যে পার্থক্য রয়েছে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে তা স্বীকৃত হয়নি। সংস্কৃতে "যতির্জিহ্বেষ্ট বিরাম স্থানম্" এবং "যতির্বিচ্ছেদঃ"—দুটোরই সংজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ছান্দাসিকদের ধারণা যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটবে, সেই সময়েই জিহ্বা বিরাম লাভ করবে এবং অন্য সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলতে থাকবে। কিন্তু একটা কথা—যখুনি দীর্ঘস্বর উচ্চারিত হয়; তখুনি জিহ্বা সামান্য বিরাম পায় এবং ঐ বিরাম পায় বলে ২৮ মাত্রার ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসান যেতে পারে।

৫) বাংলা উচ্চারণ এবং সংস্কৃত উচ্চারণ এক ধরণের নয়।—প্রত্যেক বাংলা শব্দের প্রথমে একটু শ্বাসাঘাত পড়ে—দেখ্‌বি, ভেতর, কট্‌কি প্রভৃতি। "এইত চাই"—এই'ত চাই। "আস্তে ভাই ব্যাটারা ভারি পাজী=আ'স্তে ভাই ব্যাটারা ভা'রি পাজী"। এবং এর ফলেই বাংলা শব্দের শেষের দিকের অক্ষরগুলোতে স্বর অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত 'অ'কার প্রায়ই উচ্চারিত হয়না—জল—জ+ল্; কিন্তু 'ল' বলতে পেছনে 'অ' আছে, কিন্তু জল বলতে গিয়ে জলঅকে জল্ বলে উচ্চারণ করি।

৬) বাংলার এক্-একটি ছন্দোবিভাগ আর সংস্কৃতের 'পাদ' বা ইংরাজীর foot এক নয়। সংস্কৃত "পাদ" অর্থ—একটি শ্লোকের চতুর্থাংশ।

৭) সংস্কৃত "পর্বণ্" এর অনুরূপ বাংলার 'পর্ব'।

মাত্রাবৃত্তের আধুনিক রূপ

মাত্রাবৃত্তের প্রাচীনরূপ অর্থাৎ প্রত্নমাত্রাবৃত্তের প্রাচীন রূপ এবং ব্রজবুলি ভাষায় রচিত মাত্রাবৃত্ত (প্রত্ন) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আধুনিক রূপের কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করা হ'ল—

মাত্রাবৃত্ত পয়ার (লঘু)

২১ ১ ২১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
বর্ষার নির্ঝরে / অঙ্কিত কায় = ৮+৬= ৪
দুই তীরে গিরিমালা / কতদূর যায় = ৮+৬=১৪

সূর্য চলেন ধীরে / সন্ন্যাসী বেশে = ১৪
পশ্চিম নদীতীরে / সন্ধ্যার দেশে।

মাত্রাবৃত্ত দ্বিপদী (১০+৭) মাত্রা

১১১ ১ ১ ২১১ ১ ১১ ১ ১ ১ ২
নূতন-জাগা কুঞ্জবনে / কুহরি উঠে পিক
বসন্তের চুম্বনেতে / বিবশ দশ দিক্ ॥

মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী (লঘু)

৬ ৬
ভুতের মতন চেহারা যেমন
৮
নির্বোধ অতি ঘোর।

মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী ঃ (৮+৮+১০)

অঘ্রাণ হল সারা স্বচ্ছ নদীর ধারা
বহি চলে কলসংগীতে।

বেলা যে : পড়ে এলো / জল্‌কে : চল্ = (৩+৪) ৭
(৩+২) ৫

পুরনো : সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে : ছায়াসখি / কোথা সে : জল্
কোথা সে : বাঁধাঘাট / অশথ : তল্
ছিলাম আনমনে / একেলা : গৃহকোণে
কে যেন ডাকিল রে / জল্‌কে : চল্।

মাত্রাবৃত্ত দীর্ঘ চৌপদী (৮+৮+৮+৫)

পথপাশে মল্লিকা / দাঁড়াল আসি — ৮+৫
বাতাসে সুগন্ধের / বাজাল বাঁশি ৮+৫
ধরার স্বয়ম্বরে / উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি।

৬ ৬ ৫
হে মোর চিত্ত / পুণ্যতীর্থে / জাগোরে ধীরে
এই ভারতের / মহামানবের / সাগর তীরে।

৬ ৬ ৬ ২
নমো নমো নম, সুন্দরী মম / জননী জন্ম / ভূমি
গঙ্গার তীর / স্নিগ্ধ সমীর / জীবন জুড়ালে / তুমি — ২০ মাত্রা

মাত্রাবৃত্ত মুক্তক

৫ ৫ ৫ ২
সাগর জলে / সিনান করি সজল এলো, চুলে
৫ ৫ ২
৩ বসিয়া ছিলে উপল-উপ / কূলে
৫ ২
২ শিথিল বাস
৫ ৫ ৫ ২
মাটির পরে কুটিল-রেখা / লুটিল চারি পাশ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছন্দের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ

ছন্দের মাত্রা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমূল্যধনের মতদ্বৈধ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছন্দ" শীর্ষক বইটিতে এ বিষয়ে সবিশেষে আলোচনা করেছেন। তিনি বহু কবিতা রচনা করে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেছেন—

আঁধার রজনী পোহাল
জগৎ পূরিল পুলকে
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন ৯ মাত্রার ছন্দ এবং অমূল্যধন বলেছেন ৬ মাত্রার ছন্দ। অমূল্যধন এর পর্ব ভাগ ও মাত্রা নিরূপণ করেছেন—

আঁধার রজনী / পোহালো
জগৎ পূরিল / পুলকে। ৬ / ৩

রবীন্দ্রনাথ অমূল্যধনের পর্ব ও পর্বাঙ্গ ভাগ এবং নিরূপিত মাত্রাকে গ্রহণ না করে বলেছেন—"এর ধড়টা ৬ মাত্রার, ল্যাজটা ৩ মাত্রার, চোখ দিয়ে এক পঙ্‌ক্তিকে নয় মাত্রা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অমূল্যবাবুর মতে, কান দিয়ে দেখলে ওর দুটো অসমান ভাগ বেরিয়ে পড়ে।

তিনি আরও বলেছেন—"এই ছন্দের আবর্তন ছয় মাত্রার পর্যায়ে ঘটেনা, তার কক্ষপথ সম্পূর্ণ হয়েছে নয় মাত্রায়। নয় মাত্রায় তার প্রদক্ষিণ নিজেকে বারেবারে বহুগুণিত করেছে। এই নয় মাত্রায় মাঝে মাঝে সমভাগে জোড়ের বিচ্ছেদ আছে। সেই জোড় ছয় মাত্রার না, তিন মাত্রায়।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে —

আঁধার / রজনী / পোহালো
জগৎ / পূরিল / পুলকে। ৩,৩/৩

রবীন্দ্রনাথ এই মাত্রা গণনা সম্পর্কে বলেছেন—"আমার ছন্দের লক্ষণ এই—প্রত্যেক পদে তিন কলা', প্রত্যেক কলায় তিনমাত্রা, অতএব সমগ্র পদের সমষ্টি ৯।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে—"ছন্দকে চিনতে হ'লে প্রথম দেখা চাই—তার পদের মোট মাত্রা, তারপর কলাসংখ্যা, তারপরে প্রত্যেক কলার মাত্রা।"

তিনি উদাহরণ দিয়েছেন—

সকাল বেলা / কাটিয়া গেল

বিকাল নাহি / যায়।   ৫+৫+৫+২=১৭

রবীন্দ্রনাথের মতে—এই ছন্দ ১৭ মাত্রার, এর কলা (পর্ব) সংখ্যা ৪। শেষ কলাটি ২ মাত্রার বাকীগুলো ৫ মাত্রার।

তিনি আরও উদাহরণ দিয়েছেন—

নয়নে / নিঠুর / চাহনি

হৃদয়ে / করুণা / ঢাকা।

গভীর / প্রেমের / কাহিনী

গোপন / করিয়া / রাখা।

পদের মাত্রা সংখ্যা—১৭।

কলা সংখ্যা—৬ ; একটি অপূর্ণ কলা রয়েছে।

মাত্রা সংখ্যার—পূর্ণকলার—৩ ; অপূর্ণ কলার—২

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল—

দ্বারে দ্বারে / যায় চলি / য়া

ভাসায় গো / আঁখি নীরে / সে

বিরহের ছলে চলি / য়া

মিলনের লাগি ফিরে / যে

রবীন্দ্রনাথ এর কলা বিভাগ করেছেন—৪+৪+১=৯ ; এ হচ্ছে ৯ মাত্রার লক্ষ্মণবৃত্ত ছন্দ। কিন্তু অমূল্যধন এ বিভাগ মানতে রাজী নন। তিনি বলেন যে এভাবে কলা বিভাগ করলে ছন্দ কৃত্রিম হয়ে পড়ে—শুনতে বেখাপ্যা লাগে। এর একটি কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে অমূল্যধন শব্দকে ভাঙতে রাজী নন (চলিয়া=চলি/য়া)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন যে এভাবে শব্দকে ভাঙলে শব্দের মধ্যে একটি নোতুন নৃত্যভঙ্গি জেগে ওঠে এবং তার মধ্যে একটা রসানুভূতির সৃষ্টি হয়।

অমূল্যধনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের পঙ্‌ক্তি নিয়েও মত-বিরোধ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমার বক্তব্য লেখার পঙ্‌ক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজনমত পা মুড়ে বসতে পারি, তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে এক পা বলেই স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়। ছন্দও ঠিক তাই—

সকাল বেলা কাটিয়া গেল

বিকাল নাহি যায়।

অমূল্যবাবু একে দুই চরণ বলেন, আমি বলিনে। এই দুটি ভাগকে নিয়েই ছন্দের সম্পূর্ণতা। যদি এমন হ'ত -

সকাল বেলা কাটিয়া গেল,

বকুলতলে আসন মেলো -

তাহলে নিঃসংশয়ে একে দুই চরণ বলতুম।

উপরি-উক্ত পদ্যাংশকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা'হলে বলতে হবে যে, যখন--

"সকাল বেলা কাটিয়া গেল

বিকাল নাহি যায়।"

তখন দুটো চরণ মিলেই যে একটি ভাবকে পরিস্ফুট করেছে তা সহজেই অনুমেয় হয় সুতরাং দেখতে দুটো চরণ হলেও মূলতঃ একটি চরণ।

আর এই পদ্যাংশটিকে দুটো চরণেই বিভক্ত করতে কোনো অসুবিধা নেই

"বলেছিনু / বসিতে / কাছে

দেবে কিছু / ছিল না / আশা

দেব ব'লে / যেজন / যাচে

বুঝিলে না / তাহারো / ভাষা।

(বলেছিনু…আশা—১ চরণ, দেব ব'লে… ভাষা—২ চরণ)

৪/ ৩ / ২ রবীন্দ্রনাথের মতে।

অমূল্যধন এর ছন্দোলিপি করতে গিয়ে পর্ব-ভাগ এ ভাবে করেছেন—

বলেছিনু / বসিতে কাছে — ৪ / ৫

(বা—(২ + ২ = ৪) + (৩ + ২) = ৫) ৪ / ৫

গদ্য ছন্দ

গদ্য হচ্ছে নিত্য ব্যবহারের ভাষা। কিন্তু রস-প্রকাশের জন্য ঐ নিত্য-ব্যবহারের

ভাষার মধ্যে সুর, তাল, ধ্বনির সৃষ্টি করে ছন্দের হিল্লোল কিছুটা বইয়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে শুধু নারীর নয় পুরুষেরও একটা রূপ রয়েছে। কিন্তু পুরুষের মধ্যে মেয়েলিয়ানা নেই। গদ্য ছন্দের মধ্যে রূপ রয়েছে কিন্তু মেয়েলিয়ানা নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের।" তাই এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দের মধ্যে পার্থক্য ঃ—

১) পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পঙ্‌ক্তি সীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো এবং নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক একটি পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ। পঙ্‌ক্তির শেষে থাকে একটি করে বড় যতি।

২) গদ্যের মাত্রা পদ্ধতি স্বাভাবিক।

৩) গদ্যেও পর্বাঙ্গ রয়েছে। কিন্তু পর্বাঙ্গে গোটা শব্দই থাকে, তাকে ভেঙে পর্বাঙ্গ ভাগ করা চলে না, পদ্যে তা চলে।

৪) পদ্যের পর্বাঙ্গের সঙ্গে গদ্যের পার্থক্য হচ্ছে—পদ্যের পর্বের ভেতরের পর্বাঙ্গগুলো হয় পরস্পর সমান হবে নইলে তাদের মাত্রার ক্রম অনুসারে তাদেরকে সাজাতে হবে। গদ্যের পর্বাঙ্গকে বিভিন্ন আকারে সাজান যেতে পারে।

৫) পদ্যছন্দ ঐক্য প্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্য প্রধান।

৬) পদ্যের স্তবক গঠিত হয় গদ্যে তা হয় না।

নিছক গদ্যেও যে-ছন্দ রয়েছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া হ'ল—

"রঘুপতি / আসিয়া / কহিলেন / মহারাজ / যুদ্ধের তো /
কোনো উদ্‌যোগ / দেখা যাইতেছে / না।
নক্ষত্র-রায় / কহিলেন / না ঠাকুর / ভয় পাইয়াছে।
বলিয়া অত্যন্ত / হাসিতে / লাগিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "লিপিকা" গ্রন্থটি গদ্যে লিখলেও অপূর্ব ছন্দ সৃষ্টি করেছেন—

"এখানে নামলো সন্ধ্যা / সূর্যদেব / কোন দেশে / কোন সমুদ্র পারে / তোমার প্রভাত হলো ? / অন্ধকারে / এখানে কেঁপে উঠছে / রজনী গন্ধা ॥ বাসর ঘরের দ্বারের কাছে / অবগুণ্ঠিতা / নববধূর মতো।"

এই হচ্ছে গদ্যে সাজানো খাঁটি গদ্য কবিতা। কথাগুলোকে তির্যক ভঙ্গি দান করাতেই ছন্দের ঢেউ দেখা দিয়েছে।

মাঝ দরিয়াতে ঢেউ উঠলে কিনারে এসে লাগে তার তরঙ্গের আঘাত। পরবর্তী-কালে সেই ঢেউ দেখা দিয়েছে "তটের বুকে"।

পদ্য ছন্দের গদ্য কবিতা

"হঠাৎ / সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারো / যাঁয় লাগে / তান— ॥
সমস্ত আ / কাশে বাজে"
অনাদি কা / লের— / বিরহ বে / বেদনা— ।

অথবা

ধলেশ্বরী / নদীতীরে / পিসিদের গ্রাম ॥
তার দেও / রের মেয়ে ॥
অভাগার / সাথে তার / বিবাহের / ছিল ঠিক / ঠাক

৪ / ৪/ ৪ / ২, ৪ / ৪, ৪ / ৪ / ৪ / ৪ / ২।

অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে এ ছন্দের আমদানি করেছেন। যাঁদের দেশের সঙ্গে পরিচয় নেই, এবং সব সময় বিদেশি রঙিন চশমা পরে থাকেন, তাঁরাই নোতুন কিছু একটা দেখলেই মনে করেন—এ বিদেশি জাহাজে এসে ভারতের ঘাটে ভিড়েছে।

প্রাচীন কালে ভারতীয় সাহিত্যে এই ছন্দ ছিল ; তার প্রমাণ—'যজুর্বে'দের গদ্য মন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলে স্বীকার করা হয়েছে সুতরাং গদ্য-কবিতাকে খাস্ বিলিতি জিনিষ বললে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সংস্কৃত কাব্য-অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনির গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যছন্দের তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়।" কারণ সংস্কৃত ছন্দ বাংলা ভাষায় চালাবার পক্ষে অনেকগুলো অসুবিধে রয়েছে। সে-গুলো হচ্ছে—

১) বাংলায় দীর্ঘস্বরের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

২) বাংলা হলন্ত অক্ষরকে অনেক সময় "দীর্ঘ" বলে ধরা হয়। কিন্তু ধ্বনি গুণের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় বাংলার হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর এবং সংস্কৃত দীর্ঘ অক্ষর এক নয়। বাংলায় শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ। বাংলায় পরপর শব্দগুলোকে বিযুক্ত রাখাই হচ্ছে—রীতি ; ছন্দেও সংস্কৃত পদ ছাড়া অন্যত্র সন্ধির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় না। সেই জন্যই ঐ ফাঁকটুকু রাখা হয়।

যেখানে শব্দের মধ্যে হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলে ধরা হয়, সেখানেই ঐ ফাঁকটুকু রেখে দেওয়া হয় এবং টেনে নিয়ে হলন্ত অক্ষরকে দু'মাত্রা করা হয়। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি অপরিহার্য্য বলে ফাঁক রাখবার কোনো উপায় নেই এবং যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ করেই দীর্ঘ অক্ষর ব্যবহার করতে হয়।

৩) বাংলায় চরণকে যে পর্ব বা পর্বাঙ্গে বিভক্ত করা হয় তারও একটা রীতি রয়েছে। সংস্কৃতে ঠিক এ-রীতি নেই। দীর্ঘ বা হ্রস্ব অক্ষরের পারম্পর্য জনিত এক প্রকার ধ্বনি হিল্লোলই সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন করে কিছু কবিতা রচনা অনেকেই করেছেন। একথা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে কিছু আভাষ দিয়েছি এবং কয়েক জনের নামোল্লেখ করেছি। কিন্তু যাঁরা সবিশেষ চেষ্টা করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারত চন্দ্র—

২১২ ১ ২১২ ১ ২১ ২১ ২ ১ ২
ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে
যক্ষরক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।

তবে ভারতচন্দ্র তূণকের মূল সুরটিকে রক্ষা করতে পারেন নি। ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র সম্পর্কে ঐ কথা বলতে হয়—"ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে সতি দে সতি দে"।

১২ ২১ ২ ২ ১ ২১ ২ ২
"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।" ভুজঙ্গপ্রয়াত।

তোটক:

১১ ২১১ ২১১ ২১ ২
দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে
কবি রাজ কহে যত গৌর জনে॥

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—"নূতন ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি করবার শখ যাদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাবেন। তবু বলে রাখি, তাতে সংস্কৃত ছন্দের মোট আয়তনটা পাবেন, তার ধ্বনি তরঙ্গ পাবেন না। মন্দাক্রান্তার মাত্রা গোনা একটা বাংলা ছন্দের নমুনা দেওয়া যাক—

সারা প্রভাতে বাণী
বিকালে গেঁথে আনি
ভাবিনু হারখানি
দিব গলে।

ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখি জলে।

শিখরিণীকেও এই ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে—

"কেবলি অহরহ মনে-মনে
নীরবে তোমা-সনে
যা-খুশি কহি কত ;
বিরহ ব্যথা মম নিজে নিজে
তোমারি মূরতি যে
গড়িছে অবিরত।"

"জনগণমন-অধিনায়ক" সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় আমদানি একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন তাঁর "ছন্দ" বইতে।—

জনগণমন অধি : না-য়ক জয় হে ৮+৮
ভা-রত ভা-গ্যবিধা-তা-। ১২
(পঞ্জা) জা-ব সিন্ধু গুজ : রা-ট মা-রাঠা-
দ্রা-বিড় উৎকল বঙ্গ- ২ / ৮ / ৮ / ১২
বিন্ধ হিমা-চল /: যমুনা গঙ্গা- ৮ ৮
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ- ১২
তব শুভ না-মে-জা-গে- ১২
তব শুভ আ-শিষ মা-গে- ১২
গা-হে তব জয়-গা-থা- ১২

সংস্কৃত ছন্দ পদ্ধতিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের অপর একটি পদ্যাংশের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল—

নী-ল সিন্ধুজল // ধৌত চরণ তল ৮+৮
অনিল বিকম্পিত // শ্যা-মল অঞ্চল ৮+৮
অম্বর চুম্বিত // ভা-ল হিমা-চল ৮+৮
শুভ্র তুষা-র কি : রী-টিনী- ৮ / ৫

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ছন্দের যাদুকর ছিলেন। বাংলা কাব্যে তিনি বহু

রকমের ছন্দ দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। সংস্কৃত ছন্দ, ইংরেজি ছন্দ, চীনদেশীয় ছন্দ প্রভৃতিতে বাংলা কবিতা রচনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য এনেছেন। বাংলা ছন্দের ভেতর "স্বরবৃত্ত" এবং অক্ষরবৃত্ত" বিশেষতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নোতুন প্যাটার্ন (ঘটি আকারে, বরফি আকারে) এনেছেন। এমনকি Greek "Bumos" ছন্দে "রাজর্ষি রামমোহন" রচনা করেছেন। জাপানী ছন্দেও তিনি বাংলা কবিতা রচনা করেছেন। সংস্কৃত রুচিরা, মালিনী, তোটক, মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর প্রভৃতি ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করেছেন।

তোটক :

এ কি ভাণ্ / ডারে লুট / কার ধন / লোটানো
এ কি চাষ / দিয়ে রাশ / করে ফুল / ফোটানো।

রুচিরা :

তখন কেবল / ভরিছে গগন / নূতন মেঘে
কদম কোরক / দুলিছে বাদল / বাতাস লেগে ; ।
বনান্তরের / আসিতেছে বাস / মধুর মৃদু
ছড়ায় বাতাস / বরিষা-নারীর / মুখের সীধু

পঞ্চচামর :

মহৎ ভয়ের / মুরৎ সাগর / বরণ তোমার / তমঃ শ্যামল ;
মহেশ্বরের / প্রলয় পিণাক / শোনাও আমায় / শোনাও কেবল।

মালিনী :

উড়ে চলে গেছে বুলবুল / শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর।
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন / যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দ :

বিদ্যুৎ ঠোঁট
হানে ধূম্রচুর
ঝড় গড়ুর
পাথ সাট আছোট
বন লোটায়,

গর্জন গান
মেশে হর্ষ, খেদ—
পাশারি ভেদ ;
বজ্রের বিধান
ফুল ফোটায় ।

মন্দা ক্রান্তা ঃ

৮ ৭ ৭ ৫
পিঙ্গল বিহ্বল / ব্যথিত নভতল / কইগো কই মেঘ / উদয় হও ।
সন্ধ্যার তন্দ্রার / মুরতি ধরি আজ / মন্দ্র মন্থর / বচন কও ।
৮ ৭ ৭ ৫
তুঃ— কশ্চিৎকান্তা- / বিরহ গুরুণা- / স্বাধিকার- / প্রমত্তঃ ।

ইংরেজী Young Lochvinor ছন্দে রচিত—
সিন্দুর টিপ / সিংহল দ্বীপ / কাঞ্চনময় / দেশ
স্বরবৃত্ত ছন্দেও এর ছন্দোলিপি করা যেতে পারে—
সিন্দুর : টিপ / সিংহল : দ্বীপ্ / কাঞ্চন্ : ময় / দেশ

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান

বাংলা ছন্দে প্রথম বৈচিত্র্য আনেন ভারতচন্দ্র। তিনি নূতন সংকেতে চরণ গঠন, নূতন সংখ্যক মাত্রা দিয়ে পর্ব গঠন করার চেষ্টা করেছেন।

ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। ছড়ার ছন্দকে তিনি জাতে তুলেছেন। ঈশ্বরগুপ্তের পর এলেন মদনমোহন তর্কালংকার ; তিনিও সংস্কৃত ছন্দকে বাংলাতে চালাতে চেষ্টা করেছেন। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে বাংলা-ছন্দের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনিই প্রথম দেখালেন যে বাংলায় ছেদ যতির অনুগামী হওয়ার কোনো আবশ্যক নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা ছন্দের শৃংখল মোচন করেছেন। বাংলা ছন্দ পেল স্বেচ্ছাবিহারেরও মুক্তির স্বাদ। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রতিভা" নিয়ে। বাংলা ছন্দকে ঐশ্বর্যে করলেন মণ্ডিত। বহু ছান্দসিকের বহু মতকে উড়িয়ে দিলেন। তাঁর স্ব-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল নীচে—

১) আধুনিক বাংলার ধ্বনি প্রধান (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। "মানসী" কাব্যে 'হলন্ত' অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরে ছন্দো রচনায় এক নোতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন তিনি। উত্তর কালে রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা সজ্ঞানে ঐ রীতির

অনুসরণ করে চলেছেন। ছন্দ-সাগরের এ ঢেউ বাংলার বাহিরেও যে লেগেছে তা অস্বীকার করা চলে না।

বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত মাত্রাবৃত্তে সংস্কৃত রীতিকে সজ্ঞানে অনুসরণ করার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে পদ্ধতিকে অনুসরণ না করে নিজস্ব পদ্ধতিতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কাব্য রচনা করেছেন।

২) 'স্বরবৃত্ত' বা ছড়ার ছন্দ যা এতদিন শুধু লোকগীতির বাহন ছিল তাকে মূলতঃ তিনিই ভদ্রসভার উপযোগী করে 'রাজ কণ্ঠে মণিমালা'র মতো করে গড়ে কাব্যলক্ষ্মীর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছেন—

"নিশিরাতে : রাতে / শোনা : গেল / কিসের : যেন / ধ্বনি
ঘুমের : ঘোরে / ভেবে : ছিলাম্ / মেঘের : গর / জনি

'আগমন' / খেয়া।

আমি যদি / জন্ম নিতেম্ / কালিদাসের / কালে
দৈবে হতেম / দশম রত্ন / নবরত্নের / মানে। ৪ / ৪ / ৪ / ২
একটি শ্লোকে / স্তুতি গেয়ে ৪+৪
রাজার কাছে / নিতাম চেয়ে ৪+৪
উজ্জয়িনীর / বিজন প্রান্তে / কানন-ঘেরা / বাড়ি ৪+৪+৪+২ (ক্ষণিক)

তাহারে / যা বলে / বলুক নাকো
রাখো রাখো / খুলে রাখো
শিয়রের ওই / জানলা দুটো / গায়ে লাগুক / হাওয়া

মুক্তি / পলাতকা

৩) অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যুক্তাক্ষর ব্যবহারে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—
পাষাণ মিলায়ে যায় / গায়ের বাতাসে। ৮+৬
দুর্বোধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ / দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।—৮+৬।

৪) স্তবক রচনায় বহু নোতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন।

৫) সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দেও নোতুন রীতি প্রবর্তন তিনি করেছেন। "অমিল অমিত্র"কে তিনি "সমিল" করেছেন; এবং ৮+৬=১৪ মাত্রার পরিবর্তে ৮+১০, ১০+৮, ৮+৬, ৬+৮, ১০+৪ প্রভৃতি করেছেন। (নৈবেদ্য ও চৈতালিতে এর বহু উদাহরণ রয়েছে)।

৬) 'চরণ' সৃষ্টিতে তিনি "পুচ্ছগ্রহীতা" না করে— নোতুন ধরণের সৃষ্টি করে বৈচিত্র্য এনেছেন (এই বইতেই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে)।

৭) বিলম্বিত লয়ে—৬ মাত্রার পর্ব, পাঁচ ও সাত মাত্রার পর্বও রচনা করেছেন।

৮) 'রেডাভাঙা' পয়ার অর্থাৎ "মুক্তবন্ধ ছন্দ" এর সৃষ্টিকর্তা তিনি।

৯) গদ্যের পদ নিয়ে পদ্যের গঠনরীতির স্রষ্টাও তিনি। "লিপিকা'য় তিনি এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'পুনশ্চ', "শেষ সপ্তক" গ্রন্থে গদ্য-কবিতার প্রবর্তন করেছেন তিনি।

১০) পর্বের 'মাত্রা' গণনাতেও তিনি চিরাচরিত প্রথাকে নির্বিচারে মেনে নেন নি। (এখানে এগুলোর উদাহরণ দেওয়া হ'লনা কারণ আগেই দেওয়া হয়েছে)।

প্রাকৃত ছন্দ, বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—

বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দে মূল ভিত্তি হচ্ছে—প্রাকৃত ছন্দ। বৈষ্ণব পদকর্তারা, এমনকি জয়দেবও সংস্কৃত ছন্দের চেয়ে প্রাকৃতের ছন্দের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। 'রিক্‌থ' হিসাবে বাংলা ছন্দও তাই। পদান্তে অনুপ্রাস সংস্কৃতে নেই— কিন্তু প্রাকৃত, বৈষ্ণব পদাবলীতে রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা ছন্দেও তাই পাই।

প্রাকৃত ভাষায় রচিত কবিতাগুলো প্রধানতঃ "পজ্ঝটিকা" ছন্দে রচিত। প্রাকৃত পৈঙ্গলে পজ্ঝটিকার বিবিধ রূপকে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্ব যদি 'দীর্ঘস্বর' দিয়ে আরম্ভ হয়ে থাকে তবে তাকে "দোধক" ছন্দ বলা হয়—

পিংগজ- / টা বলি / ঠারিঅ / গঙ্গা //
ধারিঅ / ণা অরি / জেন অ- / ধংগা //

(অন্ত্যানুপ্রাস লক্ষণীয়)

শেষ পর্ব দুটো "দীর্ঘস্বরের" বদলে যদি দুটো "লঘুস্বর" এবং একটি "দীর্ঘস্বর" থাকে তবে তাকে "মোদক" ছন্দ বলা হয়—

গজ্জউ মেহ কি অম্বর সাম্মর।
ফল্লউ ণীব কি বুল্লউ ভাম্মর॥
একউ জীঅ পরাহিণ অম্মহ।
কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ॥

"পজ্ঝটিকা"র "দোধাক"রূপে প্রতিটি দুমাত্রার "অতিপর্ব" থাকলে তাকে "তারক ছন্দ" বলা হয়—

ণব মঞ্জরি লিজ্জিঅ / চুঅহ্ গাছে।

পরি ফুল্লিঅ কেসু ণ / আ বণ কাছে।

প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ পর্বের প্রারম্ভে দীর্ঘস্বর থাকলে এবং বাকী সমস্তেতে হ্রস্বস্বর থাকলে—পজ্ঝটিকাকে "একাবলী" ছন্দ বলা হয়।—

সো জণ / জনমউ / সো গুণ- / মন্তউ

জে কর / পরউঅ- / আর হ- / সন্তউ।

পজ্ঝটিকার শেষাক্ষর ছাড়া যদি সমস্ত স্বর হ্রস্ব হয়—তবে তাকে "সরভ" বলে—

তরল কমলদল সরিজু অণঅণা

সরঅ সমঅ সসি সু-সরিস বঅণা।

তুলনীয় বিদ্যাপতি—

কাজরে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন বর

ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥

চর্য্যা— কাআ / তরুবর / পঞ্চ বি- / ডা-ল-।

চঞ্চল / চিএ- / পইঠো- / কাল-॥

পজ্ঝটিকার বৈশিষ্ট্য :

১) এই ছন্দে চরণে মিল রয়েছে।

২) দীর্ঘ-স্বরকে দু'মাত্রা এবং হ্রস্বস্বরকে একমাত্রা ধরতে হবে এবং প্রতিটি চরণে ৬টি মাত্রা থাকলেই হল। ১৬ মাত্রাকে ৪টি পর্বে ভাগ করা যায়। দীর্ঘস্বর বেশি থাকলে অক্ষরের সংখ্যা কম থাকে এবং লঘুস্বর বেশি থাকলে অক্ষরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকবে।

বৈষ্ণব-পদকর্তারা এই নীতির পরিসর বৃদ্ধি করেছেন—

তাল ফ- / লা দপি গুরুমতি সরসম্

কিমু বিক- লী কুরু - // যে কুচ কলসম্। ৪ / ৪ / ৪ / ৩

প্রাকৃতে ছিল ৪+৪+৪+৪=১৬। বৈষ্ণব পদকর্তারা করেছেন ১৫ (৪+৪+৪+৩); আবার অনেক সময় ১৬ মাত্রাও করেছেন। যখন ১৫ মাত্রা করেছেন তখন দীর্ঘস্বরকে "হ্রস্ব" করেছেন। এই পনের থেকে আরও ১ মাত্রা কমিয়ে ১৪ মাত্রা করে বৈষ্ণব

পদকর্তা **পয়ারের** সৃষ্টি করেছেন।

বদনে দরশন দিয়া দগধে পরাণ
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার=১৪

এখানে প্রতিটি দীর্ঘস্বরকে ১ মাত্রা করে ধরে ১৪ মাত্রা করেছেন।
প্রাকৃতের দীর্ঘ-ত্রিপদী ব্রজবুলিতে অনুসৃত হয়েছে—

জই মিত্ত ধনেসা / সসুর গিরীসা
তছ বিহু পিংধন / দীস।

তুঃ বিদ্যাপতি ঃ

কাম কম্বু ভরি　　কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত্ত সুরধনী ধারা।

গোবিন্দ দাস ঃ

গরজ তরজ মন　　রোষে বরিষ ঘন
সংশয় পড়ু অভি / সার।

রবীন্দ্রনাথ ঃ

নীল আকাশে　　তারকা ভাসে
যমুনা গাওত তান
পাদপ মরমর　　নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিত বল্লি বি / গান।

(ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

পতন অভ্যুদয়　　বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত / যাত্রী।
হে চির-সারথি　　তব রথচক্রে
মুখরিত পথদিন / রাত্রি।

প্রাকৃত দীর্ঘ চৌপদী ঃ ৮+৮+৮+৬, ৭+৯+৮+৬, ৭+৯+৮+৭, ৮+৮+৮+৭, ৮+৮+৮+৮ পর্বে প্রাকৃতে দীর্ঘ চৌপদী রচিত হয়। প্রাকৃতে এই দীর্ঘ চৌপদীকে "জলহরণা" ছন্দ "চাউবোলা" ছন্দ এবং "পদ্মাবতী" ছন্দ

বলা হয়েছে—

চল্—দমকি বল্ / ধ্লাকি ধ্লাকি করি / করি চলিআ।

বর মল্ সঅল কমল / বিপথ হিঅঅ সল / হমীর বীর জব / করি চলিআ।

(জলহরণা)

(সব মাত্রাগুলো লঘুস্বর ; দুই মাত্রার 'অতিপর্ব'।)

রে ধনি মত্ত ম / তংগজগামিনি / খংজন লোঅনি / চন্দ্রমুহী

চংচল জুব্বণ / জাতণ জানহি / ছটল সমপ্পহি / কা ই নহী।

(এখানে প্রত্যেক পর্বার্ধে দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ করা হয়েছে)

(চাউবোলা)

বৈষ্ণবপদাবলী ঃ

অধর সুধা ঝরু / মুরল তরঙ্গিনী / বিগলিত রঙ্গিনী / হৃদয় দুকুল

৮+৮ ৮+৬

মাতল নয়ন / ভ্রমর জনি ভ্রমি ভ্রমি / উড়ত পড়ত শ্রুতি / উতপল ফুল

৮+৮+৮+৬

(গোবিন্দ দাস)

রবীন্দ্রনাথ ঃ

কেদারার পরে চাপি / ভাবি শুধু ফিলসাফি

নিতান্তই চুপি চুপি / মাটির মানুষ— ৮+৮+৮+৬

শিখা ঃ প্রাকৃতের ৫ মাত্রার 'শিখা' ছন্দের সঙ্গে পদাবলীর ৫ মাত্রার ছন্দের সাদৃশ্য ঘনিষ্ট।

ফুলিঅ মহু / ভমর বহু / রঅণি পহু / কিরণ লহু / অব অরু-ব- / সন্ত

৫+৫+৫+৫+৫ ২

তুঃ বিদ্যাপতি ঃ

খনরি খন / মহযি ভই / কিছু অরুন / নয়ন কই / কপটে ধরি /

মা-ন সম্ ! মা-ন লে- : হী—।

৫+৫+৫+৫+৫+২

জয়দেব ঃ

বদসি যদি / কিঞ্চিদপি / দন্তরুচি- / কৌমদী- /

হরতি দর / তিমিরমতি / ঘো-রম্। ঐ ছন্দে রচিত।

রবীন্দ্রনাথঃ

শ্রাবণ ঘন / গহন মোহে / গোপন তব / চরণ ফেলে।

একদা তুমি / অঙ্গ ধরি / ফিরিতে নব / ভবনে।

পঞ্চ : শরে- / ভস্ম : করে- / করেছ : একি / সন্ন্যাসী

ঐ ছন্দে রচিত।

রবীন্দ্রনাথ "ভানুসিংহের পদাবলী"তে ৫+৫+৫+৫+২ কে ৫/৪/৫/৪/৫/৩ করেছেন—

৫ ৪ ৫ ৪

আ-জু-সখি / মুহু মুহু / গা-হে পিক / কুহু কুহু /

এভাবে যদি প্রাকৃত ছন্দের আলোচনা করা যায় তবে দেখতে পাওয়া যাবে যে প্রাকৃত ছন্দই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যে প্রবেশ করেছে।

ছন্দোলিপি

ছন্দ বিচার করবার সময় মনে রাখতে হবে—

১) প্রথমত ছন্দের 'জাত' নির্ণয় করতে হবে—অর্থাৎ 'চালের' দিকের চেয়ে 'চলনে'র দিকে দৃষ্টি দিতে হবে—অর্থাৎ পঙ্‌ক্তিগুলো দ্রুত চলছে না ধীরে চলছে না বিলম্বিত লয়ে চলছে। এই 'চলন' ধরতে পারলে ছন্দের জাত নির্ণয় করা যাবে। বেরিয়ে পড়বে—তা অক্ষরবৃত্ত, না মাত্রাবৃত্ত, না স্বরবৃত্ত।

২) জাত নির্ণয়ের পর চরণকে পর্বে ও পর্বাঙ্গে ভাগ করতে হবে।

৩) 'অতি পর্ব' ও 'অপূর্ণ পর্ব' নির্দেশ করতে হবে।

৪) পর্বগুলো সমমাত্রিক কি অসমাত্রিক তা নির্দেশ করতে হবে।

৫) তারপর প্রতিটি জাতের ছন্দের বৈশিষ্ট্য অনুসারে মাত্রা নিরূপণ করতে হবে। মাত্রা বিচারের সময়ে 'অপূর্ণ পর্ব'কে ছন্দের মাত্রার মধ্যে ধরতে হবে। অতি-পর্বের মাত্রা ছন্দের মাত্রা থেকে বাদ দিতে হবে।

৬) কয়পদী—অর্থাৎ 'একপদী / দ্বিপদী / ত্রিপদী / চতুষ্পদী'র উল্লেখ করতে হবে—

ক) আমাকে মা, যখন তুমি ঘুম পাড়িয়ে রাখ

খ) সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়

গ) হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান

উপরে তিন্‌টি পঙ্‌ক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রথমটির চলন—দ্রুত যে কদ্‌ম কদ্‌ম বাড়ায়ে যাচ্ছে ; সুতরাং এটা স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান, দ্রুত লয়ের ছন্দ।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি হেলেদুলে গজেন্দ্রগামিনী হয়ে চলছে—সুতরাং মাত্রাবৃত্ত (কলাবৃত্ত) বিলম্বিত লয়ের ছন্দ।

তৃতীয়টি গতি দ্রুতও নয় এবং বিলম্বিতও নয়—ধীরলয় অতএব অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। জাত ত নির্ণয় হল, এবারে পর্ব পর্বাঙ্গ ভাগ করে মাত্রা নিরূপণ করা হচ্ছে—

৪ ৪ ৪ ২

ক) আমাকে মা / যখন্ তুমি / ঘুম্ পাড়িয়ে / রাখ

৪+৪+৪+২=১৪ লঘু পয়ার।

তিনটি পূর্ণাঙ্গ পর্ব এবং অপূর্ণ পর্ব (২ মাত্রা)।

৮ ৬

২ ১ ১২১১ ২১ ১ ১ ১

খ) সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়= ৮+৬

মাত্রাবৃত্ত লঘু ত্রিপদী।

৮ ১০

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১১ ১ ১১ ১ ১১ ১১১ ১

গ) হে মোর দুর্ভাগা দেশ / যাদের করেছ অপমান

৮/১০ অক্ষরবৃত্ত

দীর্ঘ (মহা) পয়ার

যব গোধূলি সময় / বেলি

যব=অতিপর্ব ; গোধূলি সময়=পর্ব ; বেলি=অপূর্ণ পর্ব। পর্বের মাত্রা সংখ্যা নিরূপণের সময় যব (২ মাত্রা) বাদ দিতে হবে।

পরিশিষ্ট

এই অংশে রবীন্দ্রনাথের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করে মাত্রার সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম দেখান হচ্ছে।

ক) অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনি মাত্রা বাংলায় চলে না।

অথবা

"অক্ষবের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা বাংলায় চলে না" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়ে ঐ উক্তির সূত্র অনুসারে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি-দুটির ধ্বনি মাত্রা নিরূপণ কর ঃ—

"মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উটে- হিং টিং ছট্।

এই পঙ্‌ক্তি দুটোর ছন্দ—অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত বা তান প্রধান ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে—প্রতিটি অক্ষর ১ মাত্রার এবং এই ছন্দে 'ঃ', 'ং' এবং 'ৎ' এর মাত্রা গণনা করা হয না। কিন্তু আলোচ্য পঙ্‌ক্তি দুটো হচ্ছে ঐ সূত্রের মূর্ত্তিমান ব্যতিক্রম বা বিদ্রোহী। এখন পঙ্‌ক্তি দুটোর ছন্দোলিপি নির্ণব করে ব্যতিক্রম দেখান হ'ল—

মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস / ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে / হিং টিং ছট।

প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ১৫ অক্ষর এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ১২টি অক্ষর আছে। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের সূত্র অনুসারে—'ৎ' এবং 'ং' এর মাত্রা গণনা করে চলে না। যদি তাই হয় তবে এ ছন্দ পতন ঘটবে –তালও কেটে যাবে। সুতরাং ছন্দ পতন যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা কি ?

৮ ৬
১১ ১ ১ ১১:১ ১ ১১ ১২
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস / ছাড়িয়া উৎকট = ৮+৬=১৪

(এখানে 'ৎ' এর কোন গৌরব নেই 'উ' এর সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে ১ মাত্রার হয়েছে)

৮ ৬
১১ ১১ ১ ১১ ১১ ১১ ২
হঠাৎ ফুকারি উঠে / হিং টিং ছট্ = ৮+৬=১৪

এখানে 'ৎ' এর পর রেশ রয়েছে—এখানে 'ৎ' এর পৃথক সত্তা রয়েছে—ফলে ১ মাত্রা বলে গণ্য হয়েছে এবং 'ং' ও মাত্রাগৌরব লাভ করেছে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উক্তি যথার্থ। আমরা আরও তার নজির দিচ্ছি—

"ঘুম্ পাড়ানি মাসি পিসি
ঘু-ম্ দিয়ে যাও-

কান পেতে শুন্‌লেই বোঝা যায়—১ম ঘুম=১ মাত্রা দ্বিতীয় ঘুম=২ মাত্রা (ঘুউম্)। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বাংলা ছন্দ বাঙালি মেয়ের খোঁপার মতো কখনো এলো কখনো টাইট। প্রথম ঘুম—টাইট খোঁপা; দ্বিতীয় ঘুম- এলো খোঁপা।

খ) "বাঙালি আবৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচলিত ছন্দে নিজের উচ্চারণ-সম্মত মাত্রা রাখে নি"—এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি-দুটির মাত্রা নিরূপণ করেছেন তা বুঝিয়ে দাও—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

প্রচলিত রীতি মতে ওপরের ঐ পঙ্‌ক্তি দুটির ছন্দোলিপি হচ্ছে—

৮ ৬
মহাভারতের কথা / অমৃত সমান্। ৮+৬=১৪
কাশীরাম দাস কহে / শুনে পুণ্যবান্ ॥ ৮+৬=১৪

লঘু পয়ার (অক্ষরবৃত্ত)

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে পয়ারের বুনানি ঠাস বুনানি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো যায়। সুর করে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ ও শেষ ভাগে আট মাত্রা করে পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে—

১০ ৮
"মহাভারতের কথা ০০ / অমৃত সমান ০০ = ১০+৮=১৮
কাশীরাম দাস কহে / শুনে পুণ্যবান" ০০ = ১০+৮=১৮

মহাপয়ার (রবীন্দ্রনাথের মতে)

(০০=২ মাত্রা করে বাড়তি ৪ মাত্রা তিনি দিয়েছেন)

গ) চোদ্দ মাত্রার কোন কবিতার চাল যদি দুল্‌কি—চাল হয় তবে দেখা যাবে যে পয়ারের কৌলিন্য আর বজায় থাকে না—কেন? তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর "ছন্দ" বইয়ে। এবং তিনি তাঁর উক্তির

সমর্থনে কবিতা রচনা করে দেখিয়ে এর যথার্থ নিরূপণ করেছেন।

কেন / তার / মুখ / ভার / বুক / ধুক / ধুক / ০০

চোখ / লাল / লাজে / গান / রাঙা / টুক্‌টুক্‌ / ০০

পয়ারের পর্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ৮+৬

(প্রথমটির ৮ মাত্রা, দ্বিতীয়টির ৬ মাত্রা কিন্তু ঐ পঙ্‌ক্তি দুটোকে সে-ভাবে পর্ব ভাগ করা চলে না ; ফলে পয়ারের যে কৌলিন্য তা রক্ষা না করে ভঙ্গ কুলীন হয়ে গেছে।

ঘ) পয়ার কাকে বলে ? তিন রীতির তিনটি পয়ারের দৃষ্টান্ত দাও।

প্রবোধচন্দ্র পয়ারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'পয়ার' একটি ছন্দ-আকৃতির নাম, ছন্দ প্রকৃতির নাম নয়। যে ছন্দ পঙ্‌ক্তির মোট মাত্রা সংখ্যা চোদ্দ এবং যার আট মাত্রার পরে অর্ধযতি ও বাকি ছয় মাত্রার পরে পূর্ণযতি, তারই নাম পয়ার। সেইজন্যই ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন—

আট-ছয় আট-ছয়

পয়ারের ছাঁদ কয়" ছন্দ সরস্বতী, ভারতী

১৩২৫/বৈশাখ/পৃঃ ৫।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পয়ারের প্রকৃত রূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতি" ছন্দ / ছন্দের হসন্ত-হলন্ত।

অর্থাৎ যে ছন্দোবন্ধের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আট মাত্রার পরে এক যতি এবং ছয় মাত্রার পর এর একটি যতি, দেওয়া হয় তাকেই বলা হয় পয়ার। রবীন্দ্রনাথ এছাড়া আরও বলেছেন—"আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠার অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে।" ছন্দ। ঐ।

এই উক্তিগুলো থেকে বোঝা যায় যে 'পয়ার' শব্দটিকে তিনি একটি "ছন্দোবন্ধ" এর নাম হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ পয়ারকে কখনো "মহাপয়ার" আবার কখনো "বড়োপয়ার" বলেছেন। এবং আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ারকে (লঘুপয়ার) "ছোট পয়ার" বলেছেন ; ছন্দ।

আবার তিনি লিখেছেন—এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ার-জাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই "পয়ার" নাম দিচ্ছি।

ছন্দ/ছন্দের হসন্ত-হলন্ত।

এই থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ 'পয়ার' শব্দটির একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি 'পয়ার'কে বলেছেন—ছন্দের বন্ধবিশেষ, আবার কখনো, কখনো পয়ারের অর্থ করেছেন—ছন্দের রীতি বিশেষ।

তবে 'তিন' রীতিতে যে 'পয়ার প্রবন্ধ' রচনা করা চলে সে বিষয়েও তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

"নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল

ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল। (কলাবৃত্ত)

নিম্নে, স্বচ্ছ এবং ঊর্ধ্বে এই কয়েকটি শব্দে 'তিন' মাত্রা গণনা না করলে পয়ার ছন্দ ছন্দ থাকে না।" "ছন্দ"।

দলবৃত্ত পয়ারের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন—

"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,

তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর।"

এটাও পয়ার, তবে চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। ছন্দ

আট-ছয় মাত্রা বিভাগের পয়ার প্রকৃতি ভেদে তিন ধরণের—

ক) আমি যদি / জন্ম নিতেম / কালিদাসের / কালে 8+8+8+২—১8

দৈবে হতেম / দশম রত্ন / নব রত্নের / মালে — 8+8+8+২=১8

(স্বরবৃত্ত/শ্বাসাঘাত প্রধান)

৮ ৬

খ) বর্ষার নির্ঝরে / অংকিত কায় = ৮+৬=১৪

দুই তীরে গিরিখাল / কতদূর যায়। = ৮+৬=১৪

(মাত্রাবৃত্ত/কলাবৃত্ত/ধ্বনি প্রধান)

গ) মহাভারতের কথা / অমৃত সমান্। ৮+৬

কাশীরাম দাস কহে / শুনে পুণ্যবান। ৮+৬

(অক্ষরবৃত্ত/মিশ্রকলাবৃত্ত/তানপ্রধান)

ঙ) "বাংলা স্বরবর্ণের সজীবতা, একে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট করে তাকে সর্বত্র সমান ভাবে ব্যবহার করা উচিৎ—এমত চালালে বাংলা ভাষাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। শুকনো অমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভোজে কোন্‌টার দাম বেশি তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ (ছন্দ পৃঃ ৩২২ র চ /২১) এই উক্তিটির কি ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার আলোচনা করি।

রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করেছেন বাংলা ছন্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে। বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিতে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো কমানো যায়—এতে তার

গৌরব লাঘব হয় না। আবার 'ৎ' এর উচ্চারণেও কোনো নিয়মের চাপে তাকে আড়ষ্ট করা চলে না। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন—

"মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বাল্যে
নিরালয় বনছায় গেঁথেছিনু মাল্যে।
দোঁহার তরুণ প্রাণ বেঁধে দিল গন্ধে—
আলোয়-আঁধারে-মেশা নিভৃত আনন্দে।"

এখানে "দুই" "জুঁই" আপন আপন 'উ'কারকে দীর্ঘ করে দুই সিলেবল হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই—কিন্তু—

"এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।"

এখানে 'এই', 'সেই', 'কই' হ্রস্ব হয়ে পড়েছে।

তিনি আরও বলেছেন—'বৎসর, উৎসব' প্রভৃতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা কথাগুলোকে আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কমাই, এ রকম চাতুরী সম্ভব হয় যেহেতু খণ্ড ৎ-কে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধরি, আবার কখনো কানে শোনার দোহাই দিয়ে আধ অক্ষর বলে চালাই—প্রবন্ধ লেখক (প্রবোধচন্দ্র) এই অপবাদ দিয়েছেন। সেই অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ উক্তি করে উদাহরণ সহ তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে অপবাদ একেবারে ভিত্তিহীন—'বৎসর' প্রভৃতি শব্দকে রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে তুলনা করেছেন গেঞ্জির সঙ্গে—মধুপুর স্বাস্থ্যকর হাওয়া দেহ এক-আধ ইঞ্চি বাড়লেও ক্ষতি নেই আবার শহরে এসে এক-আধ ইঞ্চি কমলেও সহজে খাপ খেয়ে যায়। "কান যদি সম্মতি না দিত তাহলে কোনো কবির সাধ্য ছিল না ছন্দ নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে—

"বৎসরে বৎসরে হাঁকে গে যায়
যায় আয়ু যায় আয়ু যায় যায় আয়ু"

১ ১ ১

এখানে 'বৎসরে' (বৎ+স+রে) ৩ মাত্রা। কিন্তু সেতারে মীড় লাগাবার মতো অল্প একটু টানলে বেসুর লাগে না—

"সখা-সনে উৎসবে বৎসর যায়
শেষে মরি বিরহের ক্ষুৎ পিপাসায়"

এখানে 'উৎসবে' (৪ মাত্রা) 'বৎসর' (৩ মাত্রা) 'ক্ষুৎ' (১ মাত্রা)।

'একটি', 'তিনটি', 'একটু' শব্দগুলি হসন্তমধ্য, 'গেলমাল', 'তেলপাড়'ও সেই জাতের। অথচ হসন্তে ধ্বনি লাঘবতার অভিযোগে ওদের মাত্রা জরিমানা দিতে হয়নি।

তিন মাত্রা ও চারমাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন, কেবল মাত্রা অক্ষর গণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েছে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তাহলেই ছন্দে ধ্বনির কমতি ধরা পড়ত। আমার বক্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে ছন্দ পড়া আর বাইসিক্‌ল এর চাকা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া একই কথা, ওটা হবার জো নেই। বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে।

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল

সিট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর আটকে যাবে কাল।

বলে রাখা ভালো এটা ভিষক-ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন নয়, সাহিত্য ডাক্তারের বানানো ছড়া, ছন্দ সম্বন্ধে মত সংশয় নিবারণের উদ্দেশ্য,—একটা

এক্‌টি কথা শুনিবারে তিনটে রাত্রি মাটি,

এরপরে ঝগ্‌ড়া হবে, শেষে দাঁত্‌ কপাটি।

অথবা—

এক্‌টি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,

টাট্‌কা মাছ জুটল না তো, শুট্‌কি দেখো চেখে।

শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুণতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু তাই বলেই যে পয়ার ছন্দের নির্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয়, এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসেব করে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয়নি। কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হসন্তবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক্‌ পাঠ করতে বাঙালি পাঠকের একটুও বাঁধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিকমতো চালনা করে—

পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে,

উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছে রে।

এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড-ত-এর পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করে পড়বে। আবার যেমনি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরা যাক—

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে, কাৎলা মাছটিরে,

টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও সরসে আর জিরে,

ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কাবাটা

যত্ন করে বেছে ফেলো টুকুরো যত কাঁটা।

অমনি প্রাক্‌হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না।

তাই রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি—যথার্থ এবং দ্বিমত পোষণ করা কোনো মতেই চলে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অলঙ্কার

অলঙ্কার ঃ সংস্কৃত 'অলম্' শব্দের অর্থ হচ্ছে ভূষণ, অতএব যে বস্তু দিয়ে 'অলম্' সূচিত হয়, তাকেই অলংকার বলা হয়। অলংকার শব্দের দুটো অর্থ—১) সৌন্দর্য। সৌন্দর্য অর্থটি ব্যাপক, এবং গৌণ বা সংকীর্ণ অর্থ হচ্ছে ২) অনুপ্রাস, উপমাদি অলংকারগুলো।

অলংকার শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'সৌন্দর্য-শাস্ত্র' বা 'কাব্য-সৌন্দর্য-বিজ্ঞান'। ইংরাজীতে একে বলা হয় Aesthetic of Poetry। অনুপ্রাস উপমাদিকে বলা হয় Figures of speech। "কাব্য মীমাংসা" গ্রন্থে রাজশেখর অলংকার-শাস্ত্রকে বলেছেন—সপ্তম-বেদাঙ্গ। তিনি আরও বলেছেন যে, এই শাস্ত্রের পরিবিজ্ঞান ছাড়া বেদার্থেরও সম্যক জ্ঞান হয় না—"উপকারকত্বাদ্ অলংকারঃ সপ্তম্ অঙ্গম্ ইতি যাযা বরীবঃ। ঋতে চ তৎস্বরূপ-বিজ্ঞানাদ্ বেদার্থানবগতিঃ"

কাব্যমীমাংসা ২য়/অঃ/পৃঃ ৩

সংস্কৃত আলংকারিকেরা মানবদেহের সঙ্গে কাব্য-দেহের তুলনা করেছেন। রমণীদেহের সঙ্গে কটক-কুণ্ডলাদির যেমন সম্বন্ধ ঠিক তেমনি সম্বন্ধ রয়েছে কাব্য দেহের সঙ্গে—অনুপ্রাস, রূপক যমকাদি প্রভৃতি অলংকারগুলোর। কটক-কুণ্ডলাদি যেমন নারীদেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে ঠিক তেমনি রূপক-উপমাদি কাব্য দেহের চারুত্ব বৃদ্ধি করে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সাহিত্যমীমাংসক ধারাধিপতি ভোজদেব বলেছেন—শব্দ ও অর্থ হচ্ছে কাব্যের শরীর, রস (ধ্বনি) কাব্যের আত্মা, ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য প্রভৃতি গুণগুলো হচ্ছে কাব্যদেহের শৌর্য, দোষগুলো—কাণত্বাদির মতো, রীতিগুলো হচ্ছে—মানবদেহের অবয়ব সংগঠনের মতো এবং অলংকার হচ্ছে—কটক-কুণ্ডলাদির মতো। "কাব্যস্য শব্দার্থো শরীরম্, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্যদয় ইব, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়ঃ অবয়ব-সংস্থান-বিশেষেবৎ, অলংকারশ্চ কটক-কুণ্ডলাদিবৎ।"

সাহিত্যদর্পণ, ১/২ বৃত্তি।

কাব্যমীমাংসকার রাজশেখর কাব্যপুরুষে'র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—শব্দ এবং অর্থ তোমার দেহ। সংস্কৃত তোমার, তোমার বাহুদ্বয় প্রাকৃত ভাষা-নির্মিত,

তোমার জঘনদেশ অপভ্রংশ ভাষাময়, তোমার পদযুগল পৈশাচ ভাষা-নির্মিত। তুমি সমতা, প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজোগুণযুক্ত। তোমার বচন উক্তি নৈপুণ্যে ভূষিত। রস তোমার আত্মাস্বরূপ, তোমার রোমরাজি ছন্দোময়, অনুপ্রাস এবং উপমা প্রভৃতি তোমাকে অলংকৃত করছে।

তাই দেখতে পাই—দৈনন্দিন জীবনের ভাষা এবং সংবাদপত্রের ভাষা থেকে কাব্য-সাহিত্যের ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের ভাষা নিরাভরণা—আটপৌরে। সংবাদপত্রের ভাষা বার্তাধর্মী। কাব্যের ভাষা অলংকৃত। সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে 'হৃদয় দর্পণে'র রচয়িতা ভট্টনায়ক বলেছেন—

"শব্দ-প্রাধান্যম্ আশ্রিত্য তত্র শাস্ত্রং পৃথক বিদুঃ
অর্থে তত্ত্বেন যুক্তে তু বদন্ত্যা খ্যানম্ এতয়োঃ
দ্বয়োর্গুণত্বে ব্যাপার প্রাধান্যে কাব্যগীর্ভবেৎ॥"

অর্থাৎ বেদে এবং আইনের অনুশাসনে শব্দই হল প্রধান, তাকে পরিবর্তন করা যায় না, ইতিহাস এবং আখ্যানে ভাব এবং ঘটনাগুলোই প্রধান, সেগুলোকে কোন মতেই পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু যেখানে বাক্য এবং ভাব দুইই প্রকাশরীতির অনুগামী তখনই হয় কাব্যের সৃষ্টি। এখানে প্রকাশ ভংগিই গুরুত্বপূর্ণ, কথিত বাক্য বা ভাব নয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ-ভংগিটিকেই আলংকারিকেরা বলেছেন— "বৈদগ্ধ্যভংগি-ভণিতি।" এবং এই "বৈদগ্ধ্যভংগি-ভণিতি"ই হচ্ছে—বক্রোক্তি। ব্যবহার জীবনের কিছু সংখ্যক বস্তুর মধ্যেও কিছুটা "বৈদগ্ধ্যভংগি-ভণিতি" দেখতে পাই—যখন আমরা কোনো আমন্ত্রণ-পত্র পাঠাই তখন তার ভাষা আটপৌরে না করে কিছু মার্জিত বাণী-ভংগি দিয়ে অলংকৃত ভাষায় ব্যবহার করি……যেমন কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি কোনো সভায় সভাপতিত্ব করবেন, তখন আমরা লিখিত—"বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রী…………… সভাপতির আসন অলংকৃত করতে সম্মত হয়েছেন……"

"অলংকৃত" হচ্ছে শোভাবর্ধন করা। যে-বস্তু শোভাবর্ধন করে তাই 'অলংকার'। আচার্য দণ্ডী বলেছেন—

"কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান প্রচক্ষতে।"

কাব্যাদর্শ। ২/১

আচার্য বামন বৃত্তিতে বলেছেন— "অলংকৃতিঃ অলংকারঃ। করণব্যুৎপত্ত্যা পুনঃ অলংকারশব্দোহয়ম্ উপমাদিষু বর্ততে।" অর্থাৎ অলংকৃতি মাত্রই অলংকার। করণ-বাচ্যে ব্যুৎপত্তি করে আবার এই অলংকার শব্দই উপমাদি বুঝায়।

বামনের মতবাদ বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই—১) অলংকার হচ্ছে—সৌন্দর্য। ২) অলংকার হচ্ছে—উপমাদি বিশেষ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য সম্বন্ধে What is Poetry" গ্রন্থে Watts Dunton বলেছেন—"The Poet must rever forget that his final guest is beauty".

অলঙ্কারের শ্রেণী বিভাগ : ধারাধিপতি ভোজদেব তাঁর "শৃঙ্গার-প্রকাশ" গ্রন্থে বলেছেন—অলংকার ত্রিবিধ—অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ এবং মিশ্র।

অন্তরঙ্গ— কেশবিন্যাস, দন্তপরিকর্ম, নখচ্ছেদ প্রভৃতি।

বহিরঙ্গ— বস্ত্র, মাল্য, কটক, কুণ্ডল, কেয়ূর প্রভৃতি।

মিশ্র— ধূপ, চন্দন, কুংকুম, অলক্ত প্রভৃতি প্রসাধন বিলেপন।

বস্ত্র, মালা, কটক-কুণ্ডলাদি সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক সন্দেহ নেই। স্নান, ধূপ, চন্দন, কুংকুম, আলতা প্রভৃতি সৌন্দর্য সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু সব চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে—কেশ বিন্যাস, দন্তপরিকর্ম, নখচ্ছেদ প্রভৃতি। কারণ কেশ যদি বিন্যাস করা না হয়, দাঁতগুলো যদি মুক্তার মতো ঝক্‌ঝক্‌ না করে, আর নখগুলো যদি "বাঘনখ" যন্ত্রের মতো বড় বড় হয়, ত'হলে কটক, কেয়ূর পরিধানে, কুংকুম প্রভৃতি বিলেপনেও নারীদেহের চারুত্ব ফুটে বেরুবে না। উপরন্তু অবয়ব গঠন হ'তে হবে নিখুঁত, দেহের বরণও শ্যাম (তন্বী শ্যামা শিখর দশনা) বা দুধে আলতায় মেশান। এবং এই শ্রেণীর নারীদেহ থেকে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য আপনাতেই ফুটে বেরুবে—এমনকি প্রসাধন বিলেপনের অপেক্ষাও সেই দেহ রাখে না। অলংকারের ক্ষেত্রেও তাই অনুভূত হয়।

অলংকারিকেরা কাব্যদেহে অলংকার যোজনার ক্ষেত্রেও তিনটি শ্রেণীর কথা প্রকারান্তরে উল্লেখ করে বলেছেন—শব্দালংকার বহিরঙ্গ, অর্থালংকার অন্তরঙ্গ। শব্দা-লংকারের মধ্যে "অনুপ্রাস" যদি সীমার মধ্যে থাকে তবে অন্তরঙ্গ অলংকার হবে এবং সীমার বাইরে গেলে অর্থাৎ "পৃথগযত্ন নির্বর্তিত" হলে অট্টহাস হয়ে পড়বে। যেমন—

"ভুতানাথ ভুতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে
রক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে"

এখানে এই অনুপ্রাস—অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু 'কেন বাজাও কাঁকন কন কন কত ছলভরে" এখানে অন্তরঙ্গ ও শ্রুতি মধুর হয়েছে। তাই দেখা যায় মহৎ কবিরা অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি বাহ্য অলংকারগুলোকে বর্জন করেছেন।

প্রয়োজনীয়তা : রমণীদেহে চারুত্ব বৃদ্ধির জন্য যেমন কটক-কুণ্ডলাদির প্রয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনি কাব্যদেহের চারুত্ব বৃদ্ধির জন্য অলংকার যোজনার প্রয়োজন

রয়েছে। তবে একথা স্মার্তব্য যে অলংকার কাব্যের 'আত্মা' নয়। যে নারীদেহের অবয়ব গঠন সুডৌল ও সুন্দর এবং যৌবন দীপ্তিতে দীপ্যমানা সেই নারীদেহের মধ্যে একটা স্বাভাবিক দীপ্তি রয়েছে। সে-নারী দেহকে অলংকৃত না করলেও তার দীপ্তি ফুটে বেরুবেই। তেমনি কোনো সু-কাব্যকে অলংকৃত না করলেও তা যদি সত্যিকারের রসকাব্য হয়, তবে, তা পাঠক-পাঠিকা-চিত্তকে রসসিক্ত করে তুলবে। কাব্য-দেহের অন্তর্নিহিত লাবণ্যকে ধরতে পেরেছিলেন বলেই আনন্দ বর্ধনাচার্য প্রমুখ ধ্বনিবাদীরা 'ধ্বনি' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বস্তু-ধ্বনি, অলংকারের ধ্বনি, অত্যন্ত তিরস্কৃত প্রভৃতিকে প্রাধান্য না দিয়ে "রসের ধ্বনি"কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে তাঁরা রসের ধ্বনিকে প্রাধান্য দিলেও অলংকারকে নির্বাসিত করেন নি। অলংকারের প্রয়োজনীয়তাকে তাঁবা স্বীকার করে বলেছেন যে কাব্যের আত্মা হচ্ছে রসের ধ্বনি এবং অলংকার হবে তাবই অনুগামী। আত্মার ঔচিত্য অনুযায়ী অলংকার যোজনা করতে হবে, নইলে কাব্য অনৌচিত্য দোষে দূষিত হয়ে পড়বে। শব-শবীরে অলংকার যোজনা করলে তার ঔজ্জ্বল্য এতটুকুও বৃদ্ধি পাবে না, কারণ ঐ দেহে আত্মা নেই। যতি-শরীরকে অলংকৃত করলে হাস্যরসের খোরাক হয়ে দাঁড়াবে, সেখানেও আত্মার ঔচিত্য নেই। ফলে, কাব্যের আত্মস্বরূপ রসতত্ত্বের সম্ভাবও ঔচিত্য—এই দুটোকে অবলম্বন করে অলংকার যোজনা করে বিধেয়। যেমন—অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অংকে মহাকবি কালিদাস যেভাবে শকুন্তলাকে লাস্যময়ী বেশে আবির্ভূতা করেছিলেন, তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ দুষ্মন্তের মনোহরণের জন্য শকুন্তলাকে নিরাভরণা হলে চলত না। আবার সপ্তম অংকে শকুন্তলাকে লাস্যময়ী বেশে আবির্ভূতা করা চলে না বলেই মহাকবি কালিদাস শকুন্তলাকে নিরাভরণা করে মহামতি মারীচের আশ্রমে উপস্থিত করেছেন। প্রথম অংক হচ্ছে সম্ভোগ্যের দৃশ্য এবং সপ্তম অংকের প্রারম্ভ হচ্ছে বিপ্রলম্ভের দৃশ্য সুতরাং বলা যেতে পারে প্রথম অংকে রসদৃষ্টির পরিবেশ রক্ষার জন্য শকুন্তলার দেহকে অলংকারে ভূষিত করা একান্ত অপরিহার্য ছিল এবং সপ্তম অংকে নিরাভরণাই হচ্ছে স্বাভাবিক অলংকার। তাই বলতে হয় রসই উপেয়, অলংকার তার উপায় মাত্র।

নিরলংকৃত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের একটা মূল্য রয়েছে। কাব্য জগতে এই নিরলংকারকে স্বভাবোক্তির মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। নিরলংকার বর্ণনাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বর্ণনা এবং শ্রেষ্ঠ অলংকার—

> "নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃন্বতী
> স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালংকৃতির্যথা"

আচার্য দণ্ডী/কাব্যাদর্শ/

স্বভাবোক্তি বা জাতি হচ্ছে আদ্য অলংকার। স্বভাবোক্তিতে—"স্বভাবোক্তি দুরূহার্থ সক্রিয়া রূপবর্ণনম্" অর্থাৎ স্বভাবোক্তি অলংকার সৃষ্টি করতে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার।
তোমার কাছে রাখেনি তার
সাজের অহংকার।
অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে
তোমার কথা ঢাকে না যে তার
মুখের ঝংকার।"

কৃষ্ণ মিলনের জন্য রাধা তাঁর দেহে কোনো আভরণ রাখেন নি—
"চির চন্দন উরে হার ন দেলা"

তাই স্বাভাবিক সৌন্দর্য'ই হচ্ছে আসল সৌন্দর্য—কি কাব্যে কি মানবদেহে।

মহাকবি কালিদাস "কুমার সম্ভব" কাব্যে অকাল বসন্তের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা শুধু অনবদ্য নয়, অনুপমও বটে—

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনু বর্ত্তমানঃ
শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ" ৩/৩৬

(একটি ফুলকে পানপাত্র স্থির করে ভ্রমর-বধূ তা থেকে মধু পান করছিল, প্রিয়ার অনুবর্তন করে ভ্রমরও মধু পান করল সেই কুসুম পেয়ালা থেকে। দয়িতের স্পর্শ-সুখে হরিণবধূর চোখ নিমীলিত হয়ে আসছে, আর হরিণ তাকে আদর করছে—তার গায়ে সিং বুলিয়ে দিয়ে) অথচ এ একেবারে নিরলংকৃত বাণী। রবীন্দ্রনাথ ঐ শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন—

"একই কুসুমপাত্রে ভ্রমর পিয়ার
পীত অবশেষে মধু করিল গো পান
স্পর্শ নিমীলিত চক্ষু মৃগীর শরীরে
কৃষ্ণসার শৃঙ্গ দিয়া করিল আদর"

রবীন্দ্রনাথ/"রূপান্তর"

"অর্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা" ॥

"কুমার সম্ভব" ১০৭/৩

"আধেক মৃণাল খেয়ে সুখে চক্রবাক
আধেক তুলিয়া দিল প্রিয়ার মুখেতে।"

'রূপান্তর" / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ৪৯

"নীল নভ ঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।"

অনুপ্রাসের আমেজ থাকলেও অলংকারের বৈচিত্র্য নেই।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে নিরলংকৃত কোনো কাব্য নেই। এবং যে কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—শতকরা পঁচানব্বইটি শ্লোকই অলংকৃত; নিরলংকৃত শ্লোকের ভাগ হচ্ছে মাত্র পাঁচটি। সুতরাং অলংকারের প্রয়োজনীয়তাকে কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। কারণ কবিকৃতি সংগে অলংকার এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত স্বগত ভাবের প্রকাশের দিকেই তন্ময়ীভূত হয়ে থাকে, শব্দ এবং অর্থ আপনা-আপনি উৎসারিত হয়ে আসে—বিচিত্র বক্রোক্তির আকারে, বিভিন্ন অলংকারের রূপ ধরে। সুতরাং অলংকারকে "আগন্তুক ধর্ম" বলা চলে না। অলংকার শব্দার্থের অন্তরঙ্গ বিলাস। তাই অলংকার হবে "অপৃথগ্‌যত্ন-নির্বর্ত্য"। ধ্বন্যালোকের ২/১৭ বৃত্তিতে বলা হয়েছে—"ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্য-ক্তৌ।" (রসাভিব্যক্তি ব্যাপারে অলংকারগুলো কাব্যের বহিরঙ্গ হয় না। ক্রোচে অনুরূপ কথা বলেছেন—"The intuition and expression together of a painter are pictorial ; Those of a poet are verbal. But be it Pictorial or verbal, or musical, or whatever else it be called, to no intuiti n can expression be wanting because it is a in separable part of Intuition."

Æsthetic. Ch—1 P 13-14.

অলংকারের যদি সুষ্ঠ প্রয়োগ হয় তবে কাব্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবেই উঠবে। রবীন্দ্রনাথ অলংকারকে বলেছেন "ছবি"—"কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়।……উপমা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। …চিত্র এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ…" 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়" এই এক কথায় বলরামদাস কী না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া

ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকু প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তি লাভ করিয়াছে।"

সাহিত্যের তাৎপর্য/সাহিত্য।

অলংকারকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—১) শব্দালংকার ২) অর্থালংকার।

শব্দালঙ্কার

শব্দালংকাব—ধ্বনির অলংকার। এ ধ্বনি হচ্ছে—বর্ণধ্বনি, পদধ্বনি, কোথাওবা বাক্যধ্বনি। বর্ণধ্বনি—অনুপ্রাসে, পদধ্বনি যমকে, বক্রোক্তি, শ্লেষ এবং পুনরুক্তবদাভাসে, বাক্যধ্বনি—সর্বযমকে।

শব্দালঙ্কার ঃ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যে ধ্বনি-মাধুর্যের সৃষ্টি করে—তাকে শব্দালংকার বলা হয়। যে অলংকার বিবিধ বস্তু বা ভাবের বৈচিত্র্য সম্পাদিত করে পাঠক-পাঠিকাদের বা শ্রোতাদের বুদ্ধি ও কল্পনাকে উদ্দীপিত করে অর্থের দ্যোতনা করে তাকে **অর্থালঙ্কার** বলা হয়।

শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—শব্দালংকারে শব্দের পরিবর্তন করা চলে না। কারণ শব্দের পরিবর্তন করলে অলংকার আর থাকবে না; কিন্তু অর্থালংকারে শব্দের পরিবর্তন করে সমার্থবাচক শব্দ যোজনা করলেও অলংকার থাকবে—যেমন—"নয়নে তোমার চপল দৃষ্টি চকিতহরিণী সম"—পূর্ণোপমা হয়েছে। ঐ পঙ্‌ক্তিকে যদি এ ভাবে লেখা হয়—"আঁখিতে তোমার চপল চাহনি ত্রস্ত-মৃগী-সম"।

সমার্থকতার ভিত্তিতে শব্দ পরিবর্তন করা সত্ত্বেও পূর্ণোপমা ঠিকই রয়ে গেছে।

"ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে"

আদ্যযমক। আদিতে একই শব্দ (ভারত) পাশাপাশি দু'বার ধ্বনিত হয়েছে—দুই পৃথক অর্থে—প্রথম ভারত= কবি ভারতচন্দ্র; দ্বিতীয় 'ভারত'= দেশ ভারত বর্ষ। কিন্তু যদি বলা হয় ভারত বাংলা খ্যাত—তবে অলংকার আর হবে না।

শব্দালঙ্কার

শব্দালংকারগুলো হচ্ছে—অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি (শব্দ) শ্লেষ (শব্দ) এবং পুনরুক্তবদাভাস।

অনুপ্রাস

বর্ণ ধ্বনির অলংকার। একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্তভাবেই হোক আর বিযুক্ত ভাবেই হোক একাধিকবার ধ্বনিত হলে অনুপ্রাস হবে। বর্ণ বলতে ব্যঞ্জনবর্ণকে ধরা হয় স্বরবর্ণ নয়; স্বরবর্ণে অনুপ্রাস হবে না; যেমন—

"যেদিন হিমাদ্রি শৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়"

ভাষা ও ছন্দ/রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'আ' ধ্বনি কয়েকবার ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু একে অনুপ্রাস বলা যাবে না। কিন্তু

"আলো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা"

এখানে 'ম' একাধিকবার ধ্বনিত হয়ে অনুপ্রাসের সৃষ্টি করেছে।

অনুপ্রাস—পাঁচ রকম অন্ত্যানুপ্রাস, আদ্যানুপ্রাস, বৃত্ত্যানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস এবং শ্রুত্যনুপ্রাস।

আদিতে একই ব্যঞ্জনবর্ণ একাধিকবার ধ্বনিতে হবে, অন্তে হলে অন্ত্যানুপ্রাস হবে—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

তবে সংস্কৃতে 'ষ', 'শ', 'স' পৃথক ভাবে উচ্চারিত হয়; (পৃথক বর্ণ ধরা হয়) কিন্তু বাংলায় আমরা 'দন্ত-স', 'মূর্ধন্য-ষ' 'তালব্য-শ', বলে একই ভাবে উচ্চারণ করে একই বর্ণ (কানে) করে ফেলেছি ফলে এখানে অন্ত্যানুপ্রাস হবে।

শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে।

রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে পত্র লিখতে গিয়ে এক নোতুন ধরণের অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন, সেখানে প্রয়োজনবোধে শব্দকে ভেঙে অন্ত্যানুপ্রাস করেছেন—

"শ্রাবণে ডেপুটি **পনা**
এতো কভু নয় **সনা**
তণ প্রথা এযে **অনা**
সৃষ্টি অনাচার। পত্র/মানসী।

আবার তিনি বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করে আর এক ধরণের অন্ত্যানুপ্রাস কবেছেন—

"অন্ধকারে ওইরে **শোন**
ভারতমাতা করেন "**গ্রোন**"
এ হেন কালে ভীষ্ম **দ্রোণ**
গেলেন কোন্‌খানে।

বৃত্ত্যনুপ্রাস : অনুপ্রাস মাত্রই বৃত্ত্যনুপ্রাস। কারণ একই ব্যঞ্জনধ্বনি আবৃত্ত (repetation) হয়ে থাকে। "বৃত্তি" শব্দটি অনুপ্রাসের সঙ্গে যোগ করেন অষ্টম শতাব্দীর আলংকারিক উদ্ভট। তিনি বৃত্তি বলতে বুঝেছেন—বলার ভঙ্গি। বৃত্তি ত্রিবিধ—পুরুষা, উপনাগরিকা এবং গ্রাম্যা। 'পুরুষা'তে শ, স এর প্রাধান্য—

নিদ্রিতা প্রেয়সী
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর।"

রবীন্দ্রনাথ/স্বর্গ হইতে বিদায়/চিত্রা /

গ্রাম্যা-তে তরল 'ল' ধ্বনির প্রাধান্য—

"ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে"

জয়দেব/গীতগোবিন্দ

"মুগ্ধ ললিত গীতে অশ্রুগলিত" — নির্ভয়/মহুয়া/রবীন্দ্রনাথ।

"ললিতাধরে মিলিত হাস" — পদকর্তা জগদানন্দ।

"উপমাগরিক"তে অনুনাসিক মধুর ব্যঞ্জন ধ্বনির আবৃত্তি হয়—

"করকঙ্কণ পণ ফনীমুখ বন্ধন" — গোবিন্দদাস।

"কিংকিনী করকংকন মৃদু ঝংকৃত মনোহারী" — জগদানন্দ।

"কেন বাজাও কাঁকণ কন কন কত ছল ভরে" — রবীন্দ্রনাথ।

বৃত্ত্যনুপ্রাস : এর চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে—

ক) একটি মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ **দু'বার** ধ্বনিত হবে—

"চলইতে চাহি চরণ নাহি ধাবয়ে" — জ্ঞানদাস।

মোতিম হার বারশত টুটয়ে
গাঁথিয়া পুন অনুপাম।" — জ্ঞানদাস।

(এখানে 'হ' ও 'র' দু'বার ধ্বনিত হয়েছে)

খ) একটি ব্যঞ্জন বর্ণ বহুবার ধ্বনিত হবে—

"বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাশরি বাজিল কই" — রবীন্দ্রনাথ।

"ভাবিলা ভবেশ ভাবিনী কিভাবে আজিকে ভেটিব ভবেশে"

মধুসূদন/মেঘনাদ বধ।

গ) ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরূপানুসারে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হবে—

"কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।" রবীন্দ্রনাথ।

'ধরী', 'রবী' স্বরূপানুসারে ধ্বনিত হয়েছে।

ঘ) ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা অযুক্তভাবে ক্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হবে—

"এত ছলনা কেন বলনা

গোপললনা হ'ল সার।" নীলকণ্ঠ পদাবলী।

"কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া।" বিদ্যাপতি।

"মন্দ মন্দ হসনানন্দ নন্দন সুখকারী।" জগদানন্দ।

এখানে 'লনা', 'ন্ত' এবং 'নন্দ' বহুবার ক্রমানুসারে ধ্বনিত হয়েছে।

ছেকানুপ্রাস ঃ এর তিনটি রূপ রয়েছে—১) যুগ্মব্যঞ্জন দিয়ে এই অনুপ্রাস হয়। ২) দু'টো বা তার বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্ত থেকে ক্রমানুসারে মাত্র দু'বার ধ্বনিত হবে। ৩) বৃত্ত্যনুপ্রাসেও ব্যঞ্জনগুচ্ছের দু'বার ধ্বনিত হবার লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু সেখানে ধ্বনিত হয় অযুক্তভাবে এবং **স্বরূপানুসারে,** কিন্তু ছেকানুপ্রাসে দু'বার ধ্বনিত হবে যুক্ত বা অযুক্তভাবে এবং **ক্রমানুসারে।**

ক) ১) "লংকার পংকজ রবি গেলা অস্তাচলে।" মধুসূদন।

২) "কুঁড়ি ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।" রবীন্দ্রনাথ।

৩) "করুণা কিরণে বিকচ নয়ান।" রবীন্দ্রনাথ।

৪) "রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর।" রবীন্দ্রনাথ।

(প্রথম দু'টোতে যুক্তব্যঞ্জন এবং শেষ দু'টোতে অযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ দু'বার করে ধ্বনিত হয়েছে।

শ্রুত্যনুপ্রাস ঃ বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য-সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জন ধ্বনি দিয়ে যে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয় তাকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলে। অনুপ্রাসে একই ব্যঞ্জন বর্ণ হবে, কিন্তু শ্রুত্যনুপ্রাসে হবে পৃথক ব্যঞ্জনবর্ণ। অথচ উচ্চারণের সময় পৃথক বর্ণ ধ্বনি সাম্যে কানের পর্দা (Glide) কে ফাঁকী দিয়ে অনুপ্রাসের সৃষ্টি করে থাকে—

ক ও খ— পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা রবীন্দ্রনাথ।

হৃদয়ে চাঁদিমা আঁকা মধুর সুবাস মাখা। ঐ

স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে। ঐ

গ ও ঘ— খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে রবীন্দ্রনাথ।
বাতাস বহিছে বেগে বিজুরী চমকিছে মেঘে।

চ ও ছ— আমি ত চাহিনি কিছু শুধু বনের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম
নয়ন করিয়া নিচু। রবীন্দ্রনাথ।

যে প্রত্যুষে মধু মাছি বাহিরায় মধু যাচি। ঐ

জ ও ঝ— এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে
আঁখি তারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে। ঐ

"তোমার পিরীতে সুখ-সায়রের মাঝ
তাহাতে ডুবিল মোর কুল-শীল-লাজ।" যদুনাথ।

ট ও ঠ— পাতার কোলে বাতাস লুটে
ডাইনে তব প্রভাব উঠে। রবীন্দ্রনাথ।

তোমার বাসনাখানি আঁটিয়া মুঠি
চাহেনা আঁকড়িতে কালের ঝুঁটি। ঐ

ড ও থ— "ছুটি লয়ে কোন মতে পোটমাণ্টো তুলি রথে।" ঐ

"সে যে বৃষভানুসুতা মরমে পাইয়া বেথা।" চণ্ডীদাস।

দ ও ধ— সে চরণ-ধূলি পরশিতে করি সাধ
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরমাদ। জ্ঞানদাস।

মনে জাগিছেতে বহুতর সাধ
তুমি সাধিয়ো নাকো বাদ। (অ)

প ও ফ— "কেদারার পর চাপি ভাবি শুধু ফিলসাফি" রবীন্দ্রনাথ।

ব ও ভ— "কুলনাহি পাই তল পাব তো তবু
হতাশ মনে রইব না কভু।" ঐ

প্রেম যদি ভেঙে যায় কভু
স্মৃতিটুকু রবে মনে তবু। (অচ)

ন্দ ও ন্ধ— পৌখলি রজনী পবন বহ মন্দ
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ। গোবিন্দদাস।

ৎ ও থ— ওই মায়া চিত্রবৎ তরুলতা ছায়া পথ। রবীন্দ্রনাথ।

শব্দ শ্লেষ

কবি যখন একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেন, তখন সেই অলংকারকে শ্লেষ অলংকার বলা হয়। শব্দ শ্লেষ দু'ধরণের— ১) অভঙ্গ ২) সভঙ্গ।

যখন শব্দকে না ভেঙে শ্লেষ অলংকার করা হয় তখন তাকে অভঙ্গ শ্লেষ বলা হয়। এবং যখন শব্দকে ভেঙে অর্থের সৃষ্টি করে শ্লেষ অলংকার করা হয় তখন তাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলা হয়।

অভঙ্গ শ্লেষ ঃ

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

ঈশ্বর=ভগবান্ ; ঈশ্বর=কবি নিজে অর্থাৎ কবির নাম ঈশ্বর। গুপ্ত=লুকান (অ-দৃশ্য) ; গুপ্ত=পদবী (এখানে কবির পদবী বা উপাধী)। প্রভাকর=সূর্যের দীপ্তি বা আলো ; প্রভাকর=কবি ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সংবাদপত্র।

"দেখ নাকি হায়, বেলা চলে যায়, সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ॥" পুরবী/রবীন্দ্রনাথ।

পুরবী=সন্ধ্যা, গোধূলির রাগিণী ; পুরবী=রবীন্দ্রনাথের কাব্য। রবি=সূর্য ; রবি=রবীন্দ্রনাথ। ১) সন্ধ্যা হয়ে এসেছে (সূর্য অস্তমিত), ওস্তাদ্জী এখন পুরবী রাগিণীতে গান গাইবেন। ২) কবির বয়স হয়েছে (হয়ত বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে) তাই ভাবছেন বিদায় নেবার আগে শেষ কাব্য রচনা করলেন পুরবী নামে। ("অর্থ শ্লেষ" নামে একটি অর্থালংকার আছে। 'শব্দ শ্লেষে'র সঙ্গে 'অর্থ শ্লেষে'র পার্থক্য হচ্ছে— শব্দ শ্লেষে শব্দ পরিবর্তন করলে আর অলংকার থাকবে না, কিন্তু অর্থ শ্লেষে থাকবে)।

সভঙ্গ শ্লেষ ঃ

"আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইল মুলতানে
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন।" রোগশয্যায়/রবীন্দ্রনাথ।

মুলতান=রাগিণী বিশেষ। মূল+তান=গোড়ার তান, আসল (মূল) তান।

"অপরূপ রূপ কেশবে

দেখ্‌রে তোরা এমনধারা কালোরূপ কি আছে ভবে।" দাসরথি রায়।

কেশব—কৃষ্ণ ; কে+শবে=শবের ওপর কে ? অর্থাৎ কালী। শবরূপী মহাদেবের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। কৃষ্ণ/কালী দুই-ই কালো এবং দুইয়ের রূপই অপরূপ।

পুনরুক্তবদাভাস

এই অলংকারে মনে হবে লেখক একই অর্থে একাধিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে লেখক একই অর্থবাচক শব্দ পাশা-পাশি ব্যবহার করেন নি—ভিন্ন অর্থে সেই শব্দ ব্যবহার করেছেন—

"তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ী" রবীন্দ্রনাথ।

তনু সাধারণ অর্থ 'দেহ'। 'দেহ' অর্থও ঐ 'দেহ' বা শরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : কিন্তু 'তনু' শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে— তন্বী, ছিপ্‌ছিপে।

"ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি

হতাশ পথিক, সে যে আমি সেই আমি।"

'ত্রিযামা' শব্দের একটি অর্থ রাত্রি। আবার ত্রি তিন, যাম=প্রহর, এখানে রাত্রির তৃতীয় প্রহর না হয়ে হয়েছে—"যামিনী" শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত 'তিনপ্রহর' রাত্রি অর্থাৎ সমস্ত রাত্রি। ফলে একই অর্থে 'ত্রিযামা' ও 'যামিনী' ব্যবহৃত হয়নি।

যমক

দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসহ (বা একই শব্দ) নির্দিষ্ট ক্রমে 'সার্থক বা 'নিরর্থক' ভাবে ব্যবহৃত হলে যমক অলংকার হয়।

'সার্থক' বা 'নিরর্থক' বলার অর্থ হচ্ছে আবৃত্ত শব্দের 'অর্থ" থাকতে পারে এবং অর্থ নাও থাকতে পারে।

'নির্দিষ্ট' ক্রমের অর্থ হচ্ছে—'রাধা' শব্দটির পর 'ধারা' বসিয়ে দিলে যমক হবে না।

(ধ্বন্যালোকে যমককে কৃত্রিম অলংকার করে কাব্যে প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন, এ স্বতঃস্ফূর্ত রচনা নয়—পৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য)

যমক চার প্রকারের—১) আদ্য-মধ্য-অন্ত্য এবং সর্বভেদে যমক।

১) ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।

ভারত—কবি ভারত চন্দ্র ; ভারত—দেশ ভারতবর্ষ।

২) রজনী রজনী যাপিছে একাকিনী।

রজনী=একটি মেয়ে ; রজনী=রাত্রি (অ)

১), ২) আদ্য এবং সার্থক যমক।

৩) "পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা"

তরি=নৌকা ; তরি=তড়াইয়া যাওয়া।

৩) মধ্য এবং সার্থক যমক।

৪) আটপনে আধসের কিনিয়াছি চিনি

অন্যলোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি

চিনি=(Sugar) ; চিনি চেনা (recognise)

অন্ত্য এবং সার্থক যমক।

৫) কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।

কান্তার=বনভুমি এবং দয়িতা ; আমোদ=সৌরভ ও আনন্দ ; কান্ত=বসন্তকাল, প্রিয়তম, সহকারে=সমাগমে, সঙ্গে।

প্রথম পঙ্‌ক্তি—বনভূমি বসন্তের আগমনে সৌরভ পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি—প্রিয়তমা প্রিয়তমের আগমনে বা সঙ্গলাভে আনন্দিত।

সার্থক যমক :

১) 'অর্থ' চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূমি

রাজ স্বপ্নে অর্থ নাই যত মাথা খুঁড়ি।" রবীন্দ্রনাথ।

২) জীবে দয়া তব পরম ধর্ম 'জীবে' দয়া তব কই। কালিদাস রায় (কবিশেখর)

(রূপ গোস্বামীর প্রতি সনাতন গোস্বামীর উক্তি)

৩) "ভোজন কর কৃষ্ণজীরে, ভজন কর কৃষ্ণজীরে।" দাশরথি রায়।

প্রথম—কৃষ্ণজীরে কালোজীরে ; দ্বিতীয় কৃষ্ণজীরে=ভগবান কৃষ্ণকে।

একটি সার্থক অপরটি নিরর্থক :

১) "যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল" জ্ঞানদাস।

২) করেছ ভ্রমণ মম যৌবন-বনে। রবীন্দ্রনাথ।

৩) মলের ঝলমলে চরণ টলমল। বঙ্কিমচন্দ্র।

(যমকের সঙ্গে ইংরাজী (Pronomasia) অলঙ্কারের কিছুটা সাদৃশ্য আছে)।

বক্রোক্তি

বক্তার অভিপ্রেত অর্থটিকে শ্রোতা গ্রহণ না করে যদি অন্য অর্থে গ্রহণ করে—তাহলে বক্রোক্তি অলঙ্কার হবে।

বক্রোক্তি দু'ধরণের—১) কাকু বক্রোক্তি ২) শ্লেষ বক্রোক্তি।

কাকু বক্রোক্তি : যে অলঙ্কারটি বক্তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে (কাকু=স্বরভঙ্গী)।

১) কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? মধুসূদন।
(কেউনা)

২) নখ ছেদনে কে লয় কুঠার?
(কেউনা)

৩) 'বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে?' মধুসূদন।

৪) কে পারে ফিরাতে প্রবাহে? ঐ

শ্লেষ বক্রোক্তি : একই শব্দ নানা অর্থে গৃহীত হলে শ্লেষ বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। শব্দের অন্তর্গত বৈচিত্রের ওপর শ্লেষ বক্রোক্তি নির্ভর করে—

প্রশ্ন—দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন

উত্তর—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

প্রশ্নকারী—দ্বিজ=ব্রাহ্মণ, বারুণী=মদ্য, দ্বিজ=চন্দ্র, বারুণী=পশ্চিম দিক।

প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য=বামুন হয়ে মদ খাচ্ছ কেন?

উত্তর—সূর্য উঠছে কিনা, তাই চাঁদ পশ্চিমে ডুবছে।

অর্থালঙ্কার

যে-অলঙ্কার একান্তভাবে অর্থের ওপর নির্ভর করে সৃষ্ট তাকে অর্থালঙ্কার বলা হয়।

অর্থালঙ্কারকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—১) সাদৃশ্যমূলক

২) **বিরোধমূলক** ৩) **শৃঙ্খলা** ৪) **ন্যায়** ৫) **গূঢ়ার্থপ্রতীতে।**

সাদৃশ্য : উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, প্রতীপ, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উল্লেখ, দীপক, তুল্যযোগিতা, প্রতিবস্তূপমা, বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা, বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, স্মরণ, সামান্য, সহোক্তি, অর্থ শ্লেষ।

বিরোধ : বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, অধিক, অনুকূল, ব্যাঘাত, অন্যোন্য।

শৃঙ্খলা : কারণমালা, একাবলী, সার, মালাদীপক।

ন্যায় : অর্থাপত্তি, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান, পর্যায়, পরিবৃত্তি, সমুচ্চয়, পরিসংখ্যা, উত্তর, সমাধি, তদ্‌গুণ।

গূঢ়ার্থ-প্রতীতি : অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, আক্ষেপ, ব্যাজস্তুতি, পর্যায়োক্ত, পরিকর, সূক্ষ্ম, ব্যাজোক্তি, স্বভাবোক্তি, ভাবিক, উদাত্ত।

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার

সাদৃশ্য মূলক অলংকারকে 'উপমা' অলংকার বলা হয়। কারণ এই শ্রেণীর অলংকারগুলোর মধ্যে 'উপমা' বস্তুটি নানা ভাবে ব্যঞ্জিত হয়ে থাকে। তাই প্রাচীন কালে বলা হ'ত উপমা "কালিদাসস্য"। আধুনিক যুগে বলা হয়ে থাকে "উপমা রবীন্দ্রস্য" অর্থাৎ কালিদাস/রবীন্দ্রনাথ সাদৃশ্যমূলক অলংকার সৃষ্টিতে "সিদ্ধি" লাভ করেছেন এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁরা তুলনারহিত। সাদৃশ্যমূলক অলংকারে চারটি বস্তু থাকে :—

যে বস্তুর সঙ্গে বা যে বস্তুর দ্বারা তুলনা করা হয় তাহা—উপমান।

("যেন উপমীয়তে তদুপানম্ যশ্চ উপমীয়তে স উপমেয়ঃ")।

ক) যে-বস্তুটিকে তুলনা করা হয়—উপমান।

খ) যে বস্তুটিকে তুলনার বিষয়ীভূত করা হয় তা উপমেয়।

গ) উপমান ও উপমেয়র একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে এবং উভয়ের সেই ধর্মে সাদৃশ্য থাকবে।

ঘ) তুলনা বাচক শব্দ থাকবে—সম, নিভ, প্রতীম, যেমন, পারা প্রভৃতি।

ঙ) তবে স্মরণ রাখতে হবে যে এই তুলনা হবে বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে ; এক বা

সমজাতীয় (Similar) বস্তুর সঙ্গে হবে না, বস্তু দুটো হবে Disimilar। মানুষের চোখের সঙ্গে আর একটি মানুষের চোখের তুলনা করা যাবে না কারণ এরা Similar বস্তু; মানুষের চোখের সঙ্গে হরিণের চোখের তুলনা হবে; মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কোকিলের কণ্ঠস্বরের তুলনা করা চলবে।

উপমেয়কে আবার 'প্রকৃত' ও 'প্রস্তুত' বলা হয় এবং উপমানকে 'অপ্রকৃত' এবং 'অপ্রস্তুত' বলা হয়।

"শোভন হয়েছে রেশম চিকন চুলে"

চুল—উপমেয় (প্রকৃত বা প্রস্তুত) : রেশম—উপমান (অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুত)

"রাধার মুখটি চাঁদের মত সুন্দর"

মুখ (রাধার) উপমেয় ; চাঁদ—উপমান ; মত—তুলনা বাচক শব্দ ; উভয়ের সাধারণ ধর্ম 'সুন্দর' (রাধার মুখও সুন্দর, চাঁদও সুন্দর)।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মার্তব্য যে কথা বলার ভঙ্গী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অলংকারের পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ বক্রোক্তি ফলেই অলংকারের পরিবর্তন হবে। তাই বক্রোক্তিকে অলংকারের সারভূত আত্মা বলা অন্যায় হবে না। যেমন—

ক) রাধার মুখটি চাঁদের মত সুন্দর। (পূর্ণোপমা)

খ) রাধা চন্দ্র-মুখী। (রূপক)

গ) রাধা যেন চাঁদ। (বাচ্যৎপ্রেক্ষা)

ঘ) রাধার মুখটি চাঁদের মত। (সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই—লুপ্তোপমা.

ঙ) রাধা, চাঁদ নয়। (নিশ্চয়)

চ) রাধা নয় চাঁদ। (অপহ্নুতি)

ছ) রাধার মুখটি চাঁদের চেয়ে সুন্দর। (ব্যতিরেক)

উপমা কালিদাসস্য

'উপমা' শব্দটির সাধারণ অর্থ (তুলনা) বাদেও আরও দুটো অর্থ রয়েছে। সংকীর্ণ অর্থে উপমা হচ্ছে শধুমাত্র 'উপমা' নামক অলংকার এবং ব্যাপকার্থে হচ্ছে—সাদৃশ্যমূলক অলংকারগুলো।

কালিদাস সাদৃশ্যমূলক অলংকার সৃজনে 'সিদ্ধি' লাভ করেছেন। কালিদাসের ছিল "অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রতিভা।" ঋগবেদে দেবরাজ ইন্দ্রের বন্দনা করে বলা হয়েছে—

"ন হী নু অস্য প্রতিমানমস্তি
অন্তর্জাতেষু উত তে জানিত্বাঃ।"

(অর্থাৎ—নাই নাই এঁর সমকক্ষ, তাঁদের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন অথবা জন্মাবে)। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ফলে ঐ ঋষিবাক্যকে এখন আর সার্থক-সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না কারণ এখন বলা যেতে পারে—"উপমা রবীন্দ্রস্য"। দুই প্রান্তে দুই দিক্‌পাল ; মধ্যে রয়েছেন বিদ্যাপতি ও মধুসূদন।

কালিদাসের সমস্ত রচনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে তিনি সর্বমোট 'বারোশ' উপমা ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে 'কুমারসম্ভব' কাব্যে 'আড়াইশ', মেঘদূতে 'পঞ্চাশ'। উপমা প্রয়োগের সময় উপমান উপস্থাপনায় তিনি পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি বসন-ভূষণ, মেঘমেদুর-অম্বর, নীলনভ, নদনদী, জ্যোৎস্না রজনী এবং বিভিন্ন তরুলতার ব্যবহার করেছেন।

"যস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং ঃ প্রক্ষালনাদ্‌বারিবিহারকালে
কালিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি ঃ গঙ্গোর্মিসংসক্তজলের ভাতি"

রঘুবংশম্‌ ৬/৪৮

(এই মহীপতির অন্তঃপুর নারীগণের জলবিহার সময়ে পয়োধরলিপ্ত চন্দনের প্রক্ষালন হেতু কালিন্দ নন্দিনী যমুনা মথুরাবাস্থিতা হয়েও যেন গঙ্গাতরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। এখানে উৎপ্রেক্ষা (বাচ্য) অলংকার হয়েছে)

"তস্মাদ্‌ গচ্ছে-রনুখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গসোপান-পংক্তিম্‌
গৌরী-বক্তা-ভ্রূকুটি-বচনাং যা বিহস্যের ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরাদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা।"

পূর্ব মেঘ/৫১

(যেখান থেকে যেয়ো কনখলের দিকে। সেখানে হিমালয় থেকে নেমেছেন জহ্নু-কন্যা—(যেন) সগরতনয়দের স্বর্গগমনের সোপানশ্রেণী। কোনো ছলে তিনি যেন গৌরীর মুখের ভ্রূকুটিভঙ্গ উপহাস করে চন্দ্রকরোজ্জ্বল তরঙ্গহস্তে শম্ভুর চুলের মুঠি ধরেছেন) উৎপ্রেক্ষা অলংকারের চরম নিদর্শন।

"তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধান হেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চির-মনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠা শ্লেষ প্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূর সংস্থ"

পূঃ মে/৩

যক্ষের অবস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী অবস্থার উল্লেখ করাতে "অর্থান্তরন্যাস" অলংকার হয়েছে।

"সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতি ক্রোধ বিশ্লেষিতস্য

পূঃ মে/৭

সমাসোক্তি অলংকার।

"তাং চাবশ্যং দিবগ নাতৎ পরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নাম বিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশবন্ধঃ কুসুম সদৃশং প্রায়োশহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি"

পূঃ মে/১০

স্বভাবোক্তি।

তুঃ "অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি গণবীএ।
পঢ়মে বিবঅ দিঅহেদ্ধে কুড্ডো বেহাহিং চিওনিঙ"

গাথা সপ্তশতি

উপমা রবীন্দ্রস্য

কালিদাসের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথকে বসিয়ে সাদৃশ্যমূলক অলংকার রচনায় উভয় কবিরই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হ'ল।

কালিদাসের মেঘদূতের চরণ সংখ্যা চারশ আটষট্টি। রবীন্দ্রনাথের "মানস সুন্দরী" কবিতাটির চরণ সংখ্যা তিনশ আটত্রিশ, এবং 'উপমা' সংখ্যা চুরাশী। রবীন্দ্র-নাথের 'বলাকা' গ্রন্থের "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি" কবিতাটির চরণ সংখ্যা পয়ষট্টি এবং 'উপমা' সংখ্যা চব্বিশ। "মানস সুন্দরী" এবং "সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি" কবিতা দুটো থেকে দেখান হচ্ছে "উপমা রবীন্দ্রস্য" উক্তির যথার্থ—

"সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার"

এখানে উপমেয়—'স্রোত' ; উপমান—'তলোয়ার ; সমান ধর্ম—'বাঁকা' (উভয় ক্ষেত্রে), এখানে প্রবল সাদৃশ্যের ফলে উপমেয়কে উপমান বলে সন্দেহ করা হয়েছে, সুতরাং এ হচ্ছে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার। তবে একে পূর্ণোপমাও বলা যেতে পারে—'যেন'কে

as if না ধরে "যেমন" অর্থে প্রয়োগ করলে 'তুলনা' বাচক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। উপরন্তু ঐ পঙ্‌ক্তিগুলোতে উপমান, উপমেয়, তুলনাবাচক শব্দ এবং সাধারণ ধর্ম রয়েছে।

"এল তার ভেসে-আসা 'তারা-ফুল' নিয়ে…

"তারাফুল"—রূপক সুতরাং এটি নিরঙ্গ রূপক অলংকার।

"মনে হয়, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি"

এখানে "বাচ্যোৎপ্রেক্ষা" এবং "সমাসোক্তি" অলংকার হয়েছে।

"হে হংস বলাকা
ঝঞ্ঝামদরসে-মত্ত তোমাদের পাখা…"

Personification (সম্বোধন—হে হংস বলাকা) "সমাসোক্তি" অলংকার হয়েছে।

"মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পুলকের তরে
পুলকিত নিশ্বনের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।"

এখানে "বাচ্যোৎপ্রেক্ষা" ও "প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়েছে।

"তৃণদল
মাটির আকাশপরে ঝাপটিছে ডানা
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অংকুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।"

এখানে "সমাসোক্তি" অলংকার হয়েছে।

এবারে "মানসসুন্দরী" থেকে কিছু অলংকারের নিদর্শন তুলে ধরা হচ্ছে—

" — এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা।" (সমাসোক্তি ও রূপক)।

"নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীব বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো" (উপমা)।

"হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে।" (সমাসোক্তি)।

"যামিনী শয়ন তার
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে।" (সমাসোক্তি)

"দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা কারা হতে।" (রূপক)।

"ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছে মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।" (উল্লেখ)।

"সৌন্দর্যপাথারে
যে বেদনা বায়ুভরে ছুটে মন-তরী।" (রূপক)।

উপমা

একইবাক্যে স্বভাবধর্মে বিজাতীয় দুটো বস্তুর বিসদৃশ্য কোনো ধর্মের উল্লেখ না করে যদি বিশেষ গুণে, কিংবা অবস্থায় অথবা ক্রিয়ায় বস্তু দুটোর সাদৃশ্য দেখানো হয় তাহলে তাকে উপমা অলংকার বলা হয়।

উপমাকে সাধারণ ভাবে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের উপমা, বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা, মালোপমা, স্মরণোপমা, প্রতিবস্তূপমা।

পূর্ণোপমা : যে-উপমা অলংকারে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ অর্থাৎ চারটি অঙ্গ থাকে—তাকে পূর্ণোপমা বলা হয়—

১) "আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাত রশ্মিসম।" রবীন্দ্রনাথ।

পমেয়—ছুরি ; উপমান—প্রভাত রশ্মি ; সাধারণ ধর্ম—তীক্ষ্ণদীপ্ত ; তুলনা বাচক দ—সম ।

"সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারারত্ন যথা ।" মধুসূদন ।

মেয়—সিন্দুর বিন্দু ; উপমান—তারা ; সাধারণ ধর্ম—শোভিল (ললাটে) ; নাবাচক শব্দ—যথা (যেমন)

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরি মৃগসম ।

বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা" চণ্ডীদাস ।

"এ যে তোমার তরবারি
জ্বলে ওঠে আগুন যেন, বজ্রহেন ভারি ।" রবীন্দ্রনাথ ।

"চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে ।" রবীন্দ্রনাথ ।

লুপ্তোপমা

উপমা অলংকারে একমাত্র উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গে—একটা, দুটো এমনকি টিই লুপ্ত থাকে—তাকে লুপ্তোপমা অলংকার বলা হয় ।

তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ

কমলফুল-বিমল শেজখানি । রবীন্দ্রনাথ ।

রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদ সৌধ

সাধারণ ধর্ম লুপ্ত ঃ

শরদিন্দু নিভাননী প্রমীলা সুন্দরী

উপমেয়—আনন, উপমান—শরদিন্দু, তুলনাবাচক শব্দ—নিভ ।

আমি শিব পুজো করে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলাম— গিরিশচন্দ্র ।

"কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি" গোবিন্দ দাস ।

গ) সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ

১) "দুগ্ধফেন-শয়ন করি আলো

স্বপ্ন দেখে ঘুমায় রাজবালা" ,রবীন্দ্রনাথ।

দুগ্ধফেন-শয়ন=দুগ্ধফেন নিভ শয়ন=দুধের ফেনার মতো নরম বিছানা—তুলনা-বাচক (নিভ) শব্দ ও কোমল (নরম) (বিছানা) লুপ্ত।

২) "তিলেক না দেখি ও চাঁদবদন

মরমে মরিয়া থাকি।" চণ্ডীদাস।

৩) নীরবিলা শশিমুখী মধুসূদন।

ঘ) উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ

১) তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী

দেখিনু আঙিনা মাঝে।

মালোপমা

যেখানে উপমেয় একটি এবং উপমান একাধিক সেখানে মালোপমা হয়—

"মলিন বদনা দেবী, হায়রে যেমতি

খনির তিমির গর্ভে (না পাবে পশিতে

সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্ত-মণি,

কিম্বা বিম্বধরা রমা অম্বুরাশি তলে" মধুসূদন।

উপমেয়=দেবী ; উপমান=সূর্যকান্তমণি এবং রমা।

বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা ঃ ১) একই সাধারণ ধর্ম উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে থাকবে, এবং বিভিন্ন ভাষায় তা প্রকাশিত হবে ১) যদি তাই হয় তবে সাধারণ ধর্মের এই ভিন্নভাষারূপ দুটোকে বলা হয়—'বস্তুপ্রতিবস্তু', । ৩) এই অলংকারে তুলনাবাচক শব্দ থাকবেই থাকবে।

"নিশকালে **যথা**

মুদিল কমল দলে থাকে গুপ্তভাবে

সৌরভ এ প্রেম, বঁধু-আছিল হৃদয়ে

অন্তরিত। (দুটো পৃথক বাক্য-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য)।

উপমেয়—প্রেম ; উপমান—সৌরভ ; সাধারণ ধর্ম—গুপ্তভাবে এবং অন্তরিত (দুটোর অর্থ এক) ; তুলনা-বাচক শব্দ—যথা। মধুসূদন।

২)　　　**একটি** চুম্বন

ললাটে রাখিয়া যাও **একান্ত নির্জ্জন**

সন্ধ্যা তারার মতো।　　　　　　　　　　　রবীন্দ্রনাথ।

৩)　দারুণ নখের ঘা হিয়াতে **বিরাজে**

রক্তোৎপল **ভাসে** হেন নীল সরোমাঝে।

সাধারণ ধর্ম—বিরাজে এবং ভাসে (চণ্ডীদাস)। উপমেয়—ঘা ; উপমান—রক্তোৎপল।

বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা : এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ক) উপমেয়ের ধর্ম এবং উপমানের ধর্ম পৃথক হবে। খ) কিন্তু বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে—এরই ফলে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন হবে সাধারণ ধর্ম। গ) দুই বাক্যের অলংকার। ঘ) উপমেয় এক বাক্যে, উপমান আর এক বাক্যে থাকবে। ঙ) তুলনাবাচক শব্দ থাকবে—

"কানুর পিরীতি　　　**বলিতে বলিতে**

পাঁজর ফাটিয়া উঠে।

শঙ্খ বণিকের　　　করাত যেমতি

আসিতে যাইতে কাটে"

উপমেয়—কানু পিরীতি ; উপমান—শঙ্খ বণিকের করাত। উপমেয়ের ধর্ম—"বলিতে বলিতে……উঠে" উপমানের ধর্ম—"আসিতে……কাটে, ধর্ম দুটো ভিন্ন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—দুটোই 'বেদনাময়' ; তুলনাবাচক শব্দ—যেমতি।

২)　"দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে

জলের কিনারায়,

পথে চল্‌তে বধু যেমন নয়ন রাঙা করে

বাপের ঘরে চায়।"　　　　　　　　　রবীন্দ্রনাথ।

উপমেয়—শেষ আলোটি ; উপমান—বধু ; এদের ধর্ম বিভিন্ন। আসন্ন বিচ্ছেদ দুটোর মধ্যে রয়েছে—সূর্য অস্তমিত—পশ্চিম আকাশ হোরির আবিরের মতো রাঙা, আবার বাপের বাড়ী ফেলে মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে—এই বিদায়ের ক্ষণে বধুটি চোখ রাঙা (অশ্রু বিসর্জনের জন্য) সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে আসন্ন বিদায়ের জন্য বেদনার উদ্রেক করছে, তুলনাবাচক শব্দ—'যেমন'।

৩)　বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে

কাতর প্রবাহ, **ঢালে** ; তীর অতিক্রমি,

বারি রাশি দুই পাশে, **তেমতি** যে মনঃ
দুঃখি, দুঃখের কথা **কহে** সে অপরে।"

স্মরণোপমা

একটি বস্তু দেখে যদি সাদৃশ্যমূলক আর একটি বস্তুর কথা স্মৃতিপটে জেগে ওঠে এবং তা যদি চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে তা'হলে স্মরণোপমা হবে। একে আবার "স্মরণ" অলংকারও বলা হয়ে থাকে। বস্তু দুটোর মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে হবে, সাদৃশ্য না থাকলে স্মরণ করলেও স্মরণোপমা হবে। কারণ সেখানে তুলনা করা হল না—

"কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।"

জলের (যমুনার) রং কালো এবং কৃষ্ণের দেহের বরণো কালো, এখানে কালো জলকে দেখে 'কালা' (কৃষ্ণ) কে স্মরণ করে সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে স্মরণোপমা করা হয়েছে।

রূপক

যখন উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে কোনো "ভেদ" থাকেনা, উপবস্তু উপমেয় ও উপমানের মধ্যে "অভেদ" কল্পনা করা হয় **তখনই রূপক অলঙ্কার** হয়। রূপকে উপমেয়ের ওপর উপমানের আরোপ করা হয় তারই ফলে দুটো বিজাতীয় বস্তু হলেও অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। উপমা অলংকারে উপমেয়ের প্রাধান্য, কিন্তু রূপকে উপমানের প্রাধান্য—। যদিও রূপকে উপমেয় ও উপমানে 'অভেদ' পরিকল্পিত হয় তথাপি এ অভেদ সর্বস্য নয়।

রূপক অলংকারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—**নিরঙ্গরূপক, সাঙ্গরূপক পরম্পরিত রূপক।** নিরঙ্গরূপক দুটো ভাগে বিভক্ত—**কেবল** এবং **মালা**। এছাড়া রয়েছে **অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক**।

নিরঙ্গরূপক : 'কেবল' ঃ একটি উপমেয়ের ওপর যদি একটি উপমানের আরোপ করা হয়, তাহলে কেবল রূপক অলংকার হবে।

" চিন্তানলের দাহ থেকে
কি ভাবে পাব মুক্তি।"

উপমেয়—চিন্তা ; উপমান—অনল। এখানে 'অনল' প্রাধান্য পেলেও 'চিন্তা'কে অপহ্নব

বা গ্রাস করতে পারেনি। উপমান উপমেয়কে 'গ্রাস' করে ফেললে হয়—"অতিশয়োক্তি" অলংকার। উপমান যদি উপমেয়কে নস্যাৎ করে ফেলে তবে হবে অহ্নুতি অলংকার। রূপক অলংকারে উপমেয়ের ওপর উপমানকে এমন ভাবে আরোপ করা হয় যে উপমেয় নিজের স্বরূপতাকে হারিয়ে উপমানের মতো আচরণ করে। "রূপকং রূপিতারোপো বিষয়ে নিরপহ্নবে।" (সাহিত্যদর্পণ)।

২) "**বিরহপয়োধি পার** কিয়ে পাওয়ব।"

বিদ্যাপতি।

মালা : একটি উপমেয়ের (বিষয়) ওপর বহু উপমান বা বিষয়ীর আরোপ হলে—মালারূপক হবে।

"শীতের ওঢ়নী **পিয়া** গিরীষের বা

বরিষার ছত্র **পিয়া** দরিয়ার না

উপমেয়=পিয়া ; উপমান=ওঢ়নী, বা (বাতাস), ছত্র, না (নৌকা)।

২) "হাথক দরপণ মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল,
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার
দেহক সরবস গেহক সার" বিদ্যাপতি।

৩) আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা ? রবীন্দ্রনাথ।

সাঙ্গরূপক

উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে অভেদ নির্দেশ করে সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের অঙ্গেরও অভেদ দেখানো হয় তা'হলে সাঙ্গরূপক অলংকার হবে—"অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপনং সাঙ্গমেব তৎ" সাহিত্যদর্পণ/বিশ্বনাথ।

"নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়ে রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।
দিয়া হাস্য সুধাচার অঙ্গচ্ছটা আঠা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল"

কৃষ্ণকে ব্যাধরূপে কল্পনা করে রূপক অলংকার করা হয়েছে। উপমেয়—নন্দের নন্দন—অঙ্গী, তাঁর অঙ্গ রূপ, হাস্য, অঙ্গচ্ছটা। উপমান ব্যাধ—অঙ্গী, তার অঙ্গ

ফাঁদ, চার, আঠা। এগুলো নইলে ব্যাধের চলে না—শিকার ধরতে পারে না, কৃষ্ণও তেমনি অঙ্গ রূপ, হাস্য, অঙ্গচ্ছটা দিয়ে 'রাধাকে' শিকার করেছেন।

২) "শঙ্খধবল আকাশ গাঙে
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধর র ঘাটে কে আজ এলে ?" যতীন্দ্রমোহন।

৩) "শোকের ঝড় বহিল সভাতে
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল ; মুক্ত কেশ মেঘমালা ; ঘন
নিঃশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রু বারিধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।" মধুসূদন।

শোকের ঝড় রূপক, শোকের আধার=বামাকুল ও মুক্তকেশ—শোকের প্রকাশ চিহ্ন। মুক্তকেশ, ঘন নিঃশ্বাস, অশ্রু, হাহাকার—উপমেয় অঙ্গী শোকের অঙ্গ। ঝড়ের অঙ্গ—মেঘমালা, প্রবল বায়ু বর্ষণ (আসার), জীমূতমন্দ (মেঘ গর্জন)।

পরম্পরিত রূপক

একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ করা হলে যদি সেই আরোপ আর একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপের কারণ হয়, তা'হলে তাকে পরম্পরিত রূপক অলংকার বলা হয়। এখানে অঙ্গের বা অঙ্গীর প্রশ্ন ওঠে না।

১) "বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া" রবীন্দ্রনাথ।

দয়া=জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহ, সিংহকে বীর্যে আরোপিত করে রূপক করা হয়েছে। ফলে সমস্তই পরম্পরিত রূপক হয়েছে।

২) ষড়ধ্যায়ের **বিশ্বকাব্যে** নবরসের মহামেলা মাঝখানে তার এই **নিদাঘের বীররৌদ্রের** খেলা বিশ্বকাব্যে=রূপক নিদাঘ (গ্রীষ্ম) কে বীর-রৌদ্র রস বলে রূপ হয়েছে। প্রথম রূপকটি পরের রূপকের কারণ হওয়ায় পরম্পরিত রূপক হয়েছে।

৩) **নয়নচকোর কানুমুখ শশীবর**
কয়ল অমিয়রস পান। বিদ্যাপতি।

অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক

উপমানে যখন কোনো অসম্ভব ধর্ম কল্পনা করে তাঁকে উপমেয়ের উপর

আরোপ করা হয়, তা'হলে সেই রূপক অলংকারকে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার বলা হয়—

১) "থির বিজুরী বরণগোরী পেখনু
ঘাটের কূলে"

বিজুরী (বিদ্যুৎ) স্থির নয়, তবুও রাধার রূপকে বলা হয়েছে—বিদ্যুৎ যেন স্থির হয়ে রয়েছে। সুতরাং উপমানে অসম্ভব ধর্ম কল্পনা করা হয়েছে।

২) "নাহি কাল দেশ তুমি অনিমেষ মূরতি
তুমি **অচপল** দামিনী।" রবীন্দ্রনাথ।

তুমি (মানসী বা মানস সুন্দরী)র রূপের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে কবি বলেছেন যে চপলা দামিনী (চপলা বিদ্যুৎ) যেন অচলাল হয়ে "তুমি"র সৌন্দর্যকে বহুগুণিত করে অধিক রূপ আরোপ করা হয়েছে।

উল্লেখ

বহুগুণ থাকার জন্য একই বস্তু যদি বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় অথবা একই মানুষ যদি সেই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখে, তা'হলে উল্লেখ অলংকার হবে—

১) "একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি
প্রভাতে দিতেছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—" রবীন্দ্রনাথ।

২) স্নেহে তিনি রাজমাতা বীর্যে যুবরাজ
৩) কেহবা জিহোবা, জোব, কেহ প্রভু কয়।
৪) তার ফুলের মত মনটি নরম
বাজের মত কঠিন।

সন্দেহ

যেখানে উপমেয় এবং উপমানে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয় সেখানে সন্দেহ অলংকার হয়—

১) চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে ;
নিশীথে কি উষা আসি উত্তরিলা হেথা ? — মধুসূদন।

২) দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি ? অথবা তরুরমূল ?
অথবা, এশুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল ? — রবীন্দ্রনাথ।

৩) চিকুরে গরএ জলধারা
মুখশশী ভয়ে কিয়ে কাঁদে আঁধিয়ারা ! — বিদ্যাপতি।
(ওটা কি রাধার কালো চুলের জলধারা ?
নয়কি (রাধার মুখ) চন্দ্রের ভয়ে ভীত
অন্ধকারের দরবিগলিত অশ্রুধারা ?

উৎপ্রেক্ষা

প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে মনে হয় তা'হলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হবে।

সন্দেহ এবং **উৎপ্রেক্ষার** মধ্যে পার্থক্য রয়েছে—সন্দেহ অলংকারে উপমেয় ও উপমান দু'টোতেই সন্দেহ রয়েছে—কিন্তু উৎপ্রেক্ষাতে সন্দেহ দেখা দেবে—**উপমানে।**

(উপমান, রূপক, ভ্রান্তিমান এবং অতিশয়োক্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার পার্থক্য হচ্ছে—ঐ অলংকারগুলোতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে অভেদ আরোপিত না হলেও সংশয়ের প্রবলতার জন্য উৎপ্রেক্ষা রূপকের ধারেকাছে এসে পেঁছায়।

উৎপ্রেক্ষা, দুরকম—ক) বাচ্য খ) প্রতীয়মান। ক) যেখানে সম্ভবনা (as if) সূচক শব্দের (যেন, বুঝি, মনে হয়, মনে, গণি, জনু প্রভৃতি) উল্লেখ থাকলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার হবে। খ) আর যেখানে সম্ভাবনা বাচক শব্দটি না থেকে সম্ভাবনা জাগায় সেখানেই প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার হবে।

ক) ১) গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। — রবীন্দ্রনাথ।

২) শয়ন পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়
এমনি করে পাইবে যেন অধিক পরিচয়। — ঐ

৩) মনে হল, যেন পেরিয়ে এলাম
অন্তবিহীন পথ। — ঐ

খ) ১) লুটায় মেখলা খানি ত্যজি কই দেশ
মৌন অপমানে। রবীন্দ্রনাথ।
(এখানে 'যেন' (যেন মৌন অপমানে) কথাটি নেই)।

২) শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা। ঐ
(যেন শতেক যুগের গীতিকা)।

৩) মুখে নাহি বাণী
দেখিলাম তার সেই মুখ খানি
সেই দ্বার প্রান্তে লীন, স্তব্ধ, মর্মহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত। ঐ

ভ্রান্তিমান

সাদৃশ্য থাকার জন্য একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তু বলে ভ্রম হয় এবং সেই ভ্রম যদি সাধারণ না হয়ে কবি কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে তা'হলে সেই অলংকারকে ভ্রান্তিমান্ অলংকার বলা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, রজ্জুকে সর্পভ্রম করলে তা অলংকার হবে না। কারণ এ হচ্ছে লৌকিক ভ্রম এর মধ্যে অলৌকিকত্ব নেই। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে—যে ভ্রম করে সে কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই করে। উপমেয়কে উপমান বলে ভ্রম করা ইচ্ছাকৃত নয়, তা তার অজান্তেই হয়ে যায়। এই ভুলের মূলে রয়েছে—দুটো বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোনো সাদৃশ্য এবং সেই সাদৃশ্যবশতঃ সেই ভুল হয়ে পড়ে—

১) রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেই কোর। গোবিন্দদাস।
(কৃষ্ণ তরুকে রাধা ভেবে আলিঙ্গন করছেন।)

২) হরি হরি বোলি ধরনি ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে বিহি সঙ্কে মাগয়ে পাখ।
(কৃষ্ণ বিহনে রাধা ভুলুণ্ঠিতা, এমন সময় নীল গগন দেখে তাকে কৃষ্ণভ্রমে উদ্বেলিত হয়ে বিধি বা ভগবানের কাছে পাখা প্রার্থনা করছেন—যাতে তিনি উড়ে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন)। উভয় দৃষ্টান্তের ভ্রমে অলৌকিকত্ব দেখা দিয়েছে।

অপহ্নুতি

উপমেয়কে অপহ্নব (অস্বীকার) করে যদি উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হয় তা'হলে অপহ্নুতি অলংকার হবে।

'রূপক' অলঙ্কারে দেখা যায় যে উপমেয়ের গৌরব উপমান (অভেদ হয়ে) কিছুটা হ্রাস করে দিয়ে, উপমেয় ও উপমান অভেদ হয়ে পড়ে, কিন্তু অপহ্নুতিতে উপমেয়কে অস্বীকার করে অভেদের জায়গায় 'ভেদ'কেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অপহ্নুতি অলংকারে উপমেয়কে দু'ভাবে নিষেধ করা হয়—১) না, নয়, নহে প্রভৃতি নিষেধাত্মক অব্যয় প্রয়োগে, ২) ছল, ব্যাজ, ছদ্ম, ছলনা প্রভৃতি সত্য-গোপন বাচক শব্দ প্রয়োগ করে। প্রথমটির ক্ষেত্রে উপমান এবং উপমেয় তাকে বিভিন্ন বাক্যে এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে থাকে একই বাক্যে।

১) ক) নয় নয় ওতো আষাঢ় গগনে
জলদের গরজন
দুনিয়া যত চাপা ক্রন্দন
গুমরি উঠিছে শোন।

খ) পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝংকৃত স্বপন। — কালিদাস রায়।

গ) শোভিল বীরের করে ও নহে কৃপাণ
ভুজঙ্গিনী হরি লয় অরাতির প্রাণ। — শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

ঘ) নীরবিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, সুধাংশুনিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু। — মধুসূদন।

—সোমের প্রতি তারার উক্তি, "নয়" কথাটি উহ্য থাকায় অপহ্নুতি এখানে "গুঢ়"। — অলংকার চন্দ্রিকা / পৃঃ ৯৩

২) 'ছল' শব্দ প্রয়োগে—

ক) বৃষ্টি ছলে কাঁদিলা গগন। — মধুসূদন।

খ) দেবতা আশিষ ছলে বরষে শিশির। — অক্ষয়কুমার বড়াল।

গ) ওগো ললনা কত ছলনা
তব প্রেম মাঝে।

ঘ) ফিরে আসে রাম নয়নাভিরাম রজনী হাসিছে
জ্যোছনা ছলে। শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

ঙ) শম্ভু ধরি ছদ্ম বেশ ছলিছে উমারে।

চ) ফাগবিন্দু দেখি সিন্দুরবিন্দু কহ
কণ্টকে কঙ্কন দাগ মিছাই ভাব। চণ্ডীদাস।
গূঢ় অপহ্নুতির দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণ ত্রিযামা যামিনী চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাপন করে প্রাতে রাধার কুঞ্জে এসেছেন ; রাধা কৃষ্ণ অঙ্গে ভোগচিহ্ন দেখে অনুযোগ করলে কৃষ্ণ তার জবাব দিচ্ছেন— ঐ লাল দাগ—সিন্দুরের দাগ নয়—ফাগবিন্দু ; ও চন্দ্রার কঙ্কণের দাগ নয় তাড়াতাড়ি রাধাকুঞ্জে আসার সময় পথে কাঁটাগাছের কাঁটা লেগে ছিঁড়ে গেছে। সিন্দুর দাগ, ও কঙ্কণের দাগকে অস্বীকার করে সত্য গোপন করা হয়েছে।

নিশ্চয়

উপমানকে নিষিদ্ধ করে উপমেয়কে যেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেখানে নিশ্চয় অলংকার হয়।

'অপহ্নুতির' সঙ্গে 'নিশ্চয়' অলংকারের পার্থক্য হচ্ছে—'নিশ্চয়'তে উপমানকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং 'অপহ্নুতি'তে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ নিশ্চয়, অপহ্নুতির বিপরীত অলংকার।

১) "অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক" বিদ্যাপতি।

২) নয় এ মালা, নয় এ থালা, গন্ধজলের ঝারি
এযে ভীষণ তরবারি। রবীন্দ্রনাথ।

৩) এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত
এযে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুম রঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল কল্লোলে দুলিছে। রবীন্দ্রনাথ।

৪) কাঁতহুঁ মদন তনু দহসি হামারি
হাম নহুঁ শঙ্কর, হোঁ বরনারী। বিদ্যাপতি।

৫) "অসীম নীরদ নয়,
ওই গিরি হিমালয়"। বিহারীলাল।

প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা এই তিনটি অলংকারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যাই থাক না কেন—এরা উপমা অলংকারের বংশধর।

উপমা : এ এক বাক্যের অলংকার

প্রতিবস্তুপমা : দুটো স্বতন্ত্র বাক্যের অলংকার

দৃষ্টান্ত : দুটো স্বতন্ত্র বাক্যের অলংকার

নিদর্শনা : এক বাক্যের অলংকার

বস্তু—বাক্যের অর্থ।

প্রতিবস্তুপমা (প্রতিবস্তু + উপমা) **বৈশিষ্ট্য :**

ক) দু'বাক্যের অলংকার। খ) উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম এক—কিন্তু পৃথক পৃথক বাক্যে থাকবে প্রকাশ ভঙ্গী (ভাষা) পৃথক। গ) তুলনাবাচক শব্দ থাকবে না।

১) সৌন্দর্য তোমার মতো **বিরল** ধরায়
 বৎসরে **কয়টি** রাত্রি লভে পূর্ণিমায়। শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

'বিরল' = কম ; কয়টি = কম। (অর্থ এক ; কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর ভাষা পৃথক)

২) জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি
 কতদিন রবে ?
 নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কিরে ঝলমলে ? মধুসূদন।

৩) লংকার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে
 কে পারে
 গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে। ঐ

দৃষ্টান্ত

বৈশিষ্ট্য : ক) দুটো বাক্যের অলংকার। খ) উপমেয় একটি বাক্যে উপমান অপর বাক্যটিতে থাকে। গ) উপমেয় এবং উপমানের ধর্ম পৃথক। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ধর্মদুটো বিম্বপ্রতিবিম্বস্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্মে পরিণত হবে

ঘ) তুলনা বাচক শব্দ থাকবে না। (প্রতিবস্তুপমাতে সাধারণ ধর্ম এক, কিন্তু, প্রকাশ ভঙ্গীর ভাষা পৃথক এবং বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্ন।)

১) কথাগুলো যদি বানানো হয় দোষকী
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানোর সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয় ? রবীন্দ্রনাথ।

"বানানো" এবং "হীরে বসানো সোনার" যথাক্রমে "কথা" এবং "ফুলে"র সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম। "হীরে বসানো সোনার ফুল"—আসল ফুল নয়, কৃত্রিম ; কথাগুলো "বানানো" সুতরাং ওটাও কৃত্রিম—ভাবের দিক থেকে ঐক্য দেখা দিচ্ছে—তাই বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন স্বীকার করতে হয়। এখানে উপমেয়—কথা উপমান—ফুল। কথাগুলো বানানো হলেও চমৎকার ; সোনার ফুল সত্য না হলেও চমৎকারিত্ব রয়েছে ; এখানে তুলনা বাচক শব্দ নেই।

২) অংকুর তপন তাপে যব জারব
কি করব বারিদ মেহে
ইহ নবযৌবন বিফল গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া নেহে। বিদ্যাপতি

৩) বনে জঙ্গলে মৃগ আছে কত
কস্তুরী মৃগ কয়টা মেলে ?
মানুষ ত কত দেখিলে জীবনে
রসিক মানুষ কয়টা পেলে ?

৪) অমিতা : তোমার কিছু ক্ষতি নাই, মোরে যদি দাও
এতটুকু ভালবাসা
সমুদ্র কি রিক্ত হয়ে যাবে—আমি যদি এক
মুঠো ফেনা নিয়ে যাই ? বুদ্ধদেব বসু।

নিদর্শনা

যে অলংকারে দুটো বস্তুর 'অসম্ভব' বা 'সম্ভব' সম্বন্ধ ব্যঞ্জনায় বস্তুটির মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের দ্যোতনা করে, সেই অলংকারকে নিদর্শনা বলে।

ক) নিদর্শনা এক বাক্যের অলংকার।

খ) 'অসম্ভব' সম্বন্ধের অর্থ হচ্ছে—যে সম্পর্ক লোকের পরিচিত নয় ; এবং 'সম্ভব' সম্বন্ধের অর্থ হচ্ছে—যা মানুষের সংস্কারের মধ্যে বর্তমান থাকায় সহজেই স্বীকৃত হয়। (যেমন—"মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।" অসম্ভব হয়েও সম্ভব

হয়েছে—যেহেতু আমাদের সংস্কারের মধ্যে এ ধারণা চলে আসছে)।

গ) সম্বন্ধ সম্ভব বা অসম্ভবই হোক সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে।

ঘ) অসম্ভব সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনাই নিদর্শনার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে।

দৃষ্টান্ত দু'টো বাক্যের অলংকার। দৃষ্টান্তে আগে বাক্য শেষ হবে পরে তাদের ভাবসাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু নিদর্শনার আগে সাদৃশ্যবোধ জন্মিয়ে বাক্য শেষ হবে।

১) রাই কিশোরীর **রূপগুণ হরে**

আমার কিশোরী বধূ। — মোহিতলাল।

অর্থাৎ আমার কিশোরী বধূ যেন রাধার রূপ চুরি করে নিয়ে এসেছে। হরণ করা অসম্ভব ব্যাপার তবু তা সংস্কারে স্বীকৃত।

২) চাঁপা কোথা হতে এনেছে হরিয়া

অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া। — রবীন্দ্রনাথ।

একই ব্যাপার।

৩) "অবরণ্যে- বরি

ফেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন — মধুসূদন।

সমাসোক্তি

উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ করা হলে সমাসোক্তি অলংকার হয়।

সমাসোক্তি অলংকারের সঙ্গে রূপকের পার্থক্য হচ্ছে—রূপকে অপ্রস্তুত (উপমান) আপন রূপের আরোপে প্রস্তুতের (উপমেয়) রূপটিকে আচ্ছন্ন করে আর সমাসোক্তিতে অপ্রস্তুত আপন রূপটি ঢেকে রেখে প্রস্তুতের ওপর শুধু নিজের ব্যবহারটুকু আরোপ করে প্রস্তুতকে দান করে মধুর বৈশিষ্ট্য। সমাসোক্তিতে প্রস্তুত বাচ্য, অপ্রস্তুতটি প্রতীয়মান। আরোপিত ব্যবহার থেকে হয় অপ্রস্তুতের প্রতীতি।

১) তটিনী চলেছে অভিসারে। — শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

এখানে "অভিসার" কার্য্যটি হ'তে হচ্ছে অপ্রস্তুত নায়িকার প্রতীতি অর্থাৎ নায়িকার অভিসার-ক্রিয়াটি অচেতনা তটিনীর ওপর আরোপিত হওয়ায় মনে হচ্ছে 'তটিনী' সচেতনা নায়িকা।

২) "গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম মাঠ পারে" রবীন্দ্রনাথ।

৩) আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা। ঐ

৪) ত্বরিত পদে চলেছে গেহে
সিক্তবাস লিপ্ত দেহে
যৌবন-লাবণ্য যেন লইতে চাহে কেড়ে। ঐ

সদ্যঃস্নাতা তরুণীর সিক্তবসনখানি দেহের ওপর এমনি ভাবে লেপ্টে গেছে—তাই দেখে মনে হচ্ছে যেন তরুণীর যৌবন-লাবণ্য কেড়ে নিতে চাচ্ছে।

৫) বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে। , রবীন্দ্রনাথ।

৬) কামিনী গন্ধে যামিনী কাঁদিছে ওই
সে ত আর ফিরে এলোনা সই। অ চ.

৭) ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কুলে দিনের চিতা। রবীন্দ্রনাথ।

অতিশয়োক্তি

"অতিশয়োক্তি" শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন আলংকারিক।

১) আচার্য অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—"লোকোত্তীর্ণেন রূপেণ অবস্থানম্ ইতি অয়ম্ এব অসৌ অলংকারস্য অলংকারভাবঃ; লোকোত্তরতা এব চ অতিশয়ঃ তেন অতিশয়োক্তিঃ…" ধ্বন্যালোক, ৩/৩৬ অর্থাৎ লোকোত্তরতাই হচ্ছে "অতিশয়", তাই অতিশয় সাদৃশ্যের সীমায় বন্দী থাকতে পারে না।

২) মহেশ চন্দ্র তাঁর কাব্য প্রকাশেও অতিশয় উক্তির কথা বলেছেন।

৩) পণ্ডিতরাজ কবি জগন্নাথ (সপ্তদশ শতাব্দী) তাঁর "রসগঙ্গাধর" গ্রন্থে বলেছেন—"বিষয়িণা বিষয়স্য নিগরণম্ অতিশয়ঃ, তস্য উক্তিঃ।" অর্থাৎ বিষয়ীর (উপমান) দ্বারা বিষয়ের (উপমেয়) নিগরণ (গ্রাস) ই হচ্ছে অতিশয়। বিষয়ীর আতিশয্য হচ্ছে অত্যাধিক কবি কল্পনা (Poetic Exaggeration) সেখানেই অতিশয়োক্তি অলংকার।

অতিশয়োক্তি, পূর্ণোপমা, ব্যতিরেক, রূপক, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলংকারগুলো একই গোষ্ঠীর সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। কারণ এরা হচ্ছে সাদৃশ্যমূলক অলংকার। সাদৃশ্যাত্মক অলংকারের যাত্রা পথ শুরু হয় 'উপমা' অলংকার থেকে এবং উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তিতে।

পূর্ণোপমাতে—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম তুলনাবাচক শব্দ থাকবে।
ব্যতিরেকে—উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেখাতে হয়।
রূপকে—উপমেয় ও উপমানকে 'অভেদ' পরিকল্পিত হয়, তবে অভেদ সর্বস্ব নয়।
অপহ্নুতি উপমেয়কে নস্যাৎ করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।
অতিশয়োক্তিতে—ক্ষেত্রবিশেষে 'উপমান' উপমেয়কে গ্রাস করবে।

প্রতিটি অলঙ্কারের উক্তি সাধারণ উক্তির চেয়ে বাড়িয়ে বলা হয়—অর্থাৎ অতিশয়ের স্পর্শ থাকবেই তবে অতিশয়োক্তি তা সম্ভাব্য সীমা অতিক্রান্ত করে যাবে।

অতিশয় উক্তিতে পূর্ণ—

ক) আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যা তারা ওঠা
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা। — রবীন্দ্রনাথ।

খ) মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী
দেব খোঁপায় তারার ফুল।
জ্যোছনার সঙ্গে চন্দন দিয়ে
মাখাব তোমার গায়ে
রামধনু হ'তে লাল রঙটুকু দিয়ে
আলতা পড়াব পায়ে। — নজরুল ইস্‌লাম।

গ) যাঁহা যাঁহা নিকট সই তনু তনু জ্যোতি
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকায় হোতি। — বিদ্যাপতি।

ঘ) যতনে আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুলি
আমিয়ার ছাঁচে যদি গড়াই পুতুলী।
রসের সায়রে যদি করাই সিনান
তবুও না হয় তোমার নিছুনি সমান। — বলরাম দাস।

উপমান উপমেয়কে গ্রাস করেছে :

১) "গগনেতে একই চাঁদ ইহাই মোরা জানি
ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ কে রোপিল আনি" — জ্ঞানদাস।

(চাঁদ=উপমান, উপমেয় কৃষ্ণ (কালাচাঁদ) কালা বা কৃষ্ণের উল্লেখ নেই।

২) বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি
ত্যাজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে। — রবীন্দ্রনাথ।

উপমান—যুগলস্বর্গ। উপমেয়—স্তনযুগল। কিন্তু এখানে স্তনযুগলের উল্লেখ নেই। স্তনযুগলের অভাবে বক্ষের নিচোল বাস—
গড়াগড়ি দিচ্ছে।

২) জানেনা সে কিসের কারণ
নারীর অধরে হায় পান করে
কালকূট মানে না বারণ। মোহিতলাল।

উপমান=কালকূট ; উপমেয়=চুম্বন (উল্লেখ নেই, গ্রাস করেছে)।

ব্যতিরেক

উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করলে ব্যতিরেক অলংকার হবে। ব্যতিরেক ভেদ প্রধান অলংকার।

১) "সুধা হতে সুধাময় দুগ্ধ তার" রবীন্দ্রনাথ।

২) কল কল্লোলে লাজ দিল
নারীকণ্ঠের কাকলি— ঐ

৩) নবীননবনী নিন্দিত করে
দোহন করেছে দুগ্ধ। ঐ

৪) সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ
সে মাটি সোনার বাড়া। ঐ

৫) বিমল হেম যিনি তনু অনুপামরে। গোবিন্দ দাস।

৬) কণ্ঠস্বরে বজ্রলজ্জাহত। রবীন্দ্রনাথ।

৭) "এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।" ঐ

প্রতীপ

ক) উপমান যদি উপমেয়রূপে কল্পিত হয় অথবা খ) উপমেয় নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বগুণে যদি উপমানকে প্রত্যাখ্যান করে তা'হলে প্রতীপ অলংকার হবে।

ব্যতিরেক ও প্রতীপের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—ব্যতিরেক উপমেয়ের প্রাধান্য (উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেখাতে হবে) কিন্তু প্রতীপে উপমানকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

ক) ১) প্রিয়ার হাসির মত ফুটল শতদল। রবীন্দ্রনাথ।

২) নিবিড় কুন্তলসম   মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে।   রবীন্দ্রনাথ।

৩) প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন-গুচ্ছ।   রবীন্দ্রনাথ।

খ) "কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে
মুখভয়ে চাঁদ আকাশে
হরিণী নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে।"   বিদ্যাপতি।

বিরোধ-মূলক অলঙ্কার

বিরোধাভাস ঃ

যখন দুটো বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হলেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেখানে বিরোধ নেই, তখন বিরোধাভাস অলংকার হবে। ইংরাজী Oxymoron এবং Epigram অলংকারের সঙ্গে বিরোধাভাসের অনেকটা মিল রয়েছে। (The epigram is an apparent Contradiction in language which by Causing a temporary shock, rouses our attention to some important meaning underneath.)

১) অচক্ষু সর্বত্র চান   অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।   ভারতচন্দ্র।

চোখ নেই অথচ সবই দেখছেন, কান নেই সবই শুনছেন, পা নেই তবুও হেঁটে বেড়াচ্ছেন—এ অসম্ভব কথা—কিন্তু ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব।

২) মক্ষিকাও গলে নাগো পড়িলে অমৃতহ্রদে।   মধুসূদন।

হ্রদে পড়া এবং মক্ষিকার না গলা পরস্পব বিরোধী, তবে হ্রদটি সাধারণ হ্রদ নয়—অ-মৃত হ্রদ এই হ্রদ ধ্বংস করে না—অমর করে ; ফলে বিরোধের অবসান ঘটেছে।

৩) "সবে বলে মোরে কানু-কলঙ্কিনী গরবে ভরল দে।"   জ্ঞানদাস।

কলঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে গৌরববোধ করা পরস্পর বিরোধী—কিন্তু এ কলংক লৌকিক কলংক নয়, অলৌকিক—'কানু-কলঙ্কিনী'।

৪) "দুহুঁ করে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"   চণ্ডীদাস।

৫) যারে এক তিল না হেরিলে শতযুগ মনে হয়। চণ্ডীদাস।

৬) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান। নজরুল ইস্‌লাম।

৭) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। রবীন্দ্রনাথ।

৮) ' অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ" রবীন্দ্রনাথ।

বিভাবনা

কারণ ছাড়া কাজ হয়ে গেলে বিভাবনা অলংকার হবে। কিন্তু কারণহীন কাজ হওয়া সম্ভব নয়। আসল কথা হচ্ছে এই অলংকারে প্রসিদ্ধ কারণ থেকে কাজ হচ্ছে না এটুকু দেখিয়ে কল্পিত কারণের সহায়তা নিয়েই কার্যসিদ্ধি করা হয়, ফলে বিরোধের অবসান ঘটে। নোতুন কারণটির উল্লেখ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে—

১) "বিনা মেঘে বজ্রপাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
বিনা বাতে নিভে গেল মঙ্গল প্রদীপ।" অমৃতলাল বসু।
(স্যার আশুতোষের মৃত্যুতে)

২) "এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।" চণ্ডীদাস।

নাক বন্ধ করলে (টিপে ধরলে) গন্ধ পাওয়া যাবে না এটাই স্বাভাবিক ; কিন্তু গন্ধ পাওয়া তথাপি যাচ্ছে—ফলে কার্য-কারণের সম্পর্কবিহীন হয়েছে—বিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু অপর কারণটির উল্লেখ নেই—সেটা হচ্ছে— রাধা কানু প্রেমে বিভোর।

৩) সে এলনা না, এল তার মধুর মিলন,
দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন ?
চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর ? রবীন্দ্রনাথ।

যৌবনের বসন্তকালে—কবির প্রিয়া অশরীরিণী, মিলন, দৃষ্টি, চুম্বন—সবই ভাবলোকে (ভাবোল্লাসে), তাই, মিলন, দৃষ্টি, চুম্বন—সম্ভব হয়েছে।

বিশেষোক্তি

কারণ থাকা সত্ত্বেও যদি ফলের অভাব দেখা দেয় তবে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হবে।

১) "যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ
অনল আমারে নাহি দহে ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় মরণ যে বাসে ভয়
কালা যার হিয়া মাঝে রহে।"

বিষ পান করেও মৃত্যু হ'লনা—সুতরাং কারণ থাকা সত্ত্বেও ফলের অভাব দেখা দিয়ে বিরোধের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ 'বিষ' সত্যিকারের বিষ নয়—এ কালা-প্রেম—বিরহে দহন করছে—বেদনা-বিষে জর্জরিত করছে—তবুত মৃত্যু হচ্ছেনা। বিরোধের অবসান ঘটেছে।

২) "মহৈশ্চর্যে আছে নম্র, মহদৈন্যে কে হয়নি নত
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কহ মোরে সর্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম,
নারদ কহিলা ধীরে—অযোধ্যার রঘুপতি রাম।" রবীন্দ্রনাথ।
(এখানে কবি নিজেই সব বিশ্লেষণ করে উত্তর দিয়েছেন)।

৩) "দেহ দগ্ধ করি তার শক্তি তুমি পারনি নাশিতে
কন্দর্প ভুবন জয় করে, শম্ভু হাসিতে হাসিতে।" শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

দহন করায় শক্তিনাস হবে, কিন্তু এখানে তা হয়নি ফলে বিরোধ অলংকার হয়েছে।

অসঙ্গতি

কার্য ও কারণ যদি পৃথক ভাবে থেকে একটা সঙ্গতির অভাবের দ্যোতনা করে তবে অসঙ্গতি অলংকার হবে। বিরোধ অলংকারের মতো পরস্পর বিরোধী পদার্থ দুটো থাকে একই আশ্রয়ে, কিন্তু অসঙ্গতি পৃথক আশ্রয়ে থাকে কারণ ও কার্য। এইখানে তফাৎ।

১) "একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।" ভারতচন্দ্র।

শিবের কপালের নেত্রবহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হয় এবং তার ফলে রতি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হ'য়ে তার কপাল পুড়ল। (শিবের কপালের আগুনে)। একের=শিবের ; আরের = রতির।

২) ওদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ।

৩) কঠিন মাটিতে বঁধু চলে যায়

মোর বুকে ব্যথা বাজে। শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

বিষম

১) কার্য-কারণের মধ্যে যদি বৈষম্য দেখা দিয়ে বিরূপতার সৃষ্টি করে, অথবা যে ফলের আশা করা গিয়েছিল তা না হয়ে যদি অবাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় ২) অথবা যদি দুটো অসম্ভব ঘটনার মিলন হয় তাহলে বিষম অলংকার হবে।

ক) ১) "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু

অনলে পুড়িয়া গেল,

অমিয় সাগরে সিনান করিতে

সকাল গরল ভেল।" চণ্ডীদাস।

খ) ১) হেরিলে ফণী পলায় তরাসে

যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত,—

হায়রে এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে

বাঁধিতে গলায় ? মধুসূদন।

ফণী=সর্প, এ ফণী=রক্ষঃ সুন্দরীর বেণী। আসল ফণী কে গলায় জড়াবে ? কেউনা, কারণ সে যমদূত, কিন্তু ফণীরূপী বেণীকে প্রেমিক মাত্রই গলায় বাঁধতে চাইবে।

শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার

কারণ মালা

কোনো কারণের কার্য যদি পরবর্ত্তী কোনো কার্যের কারণ হয় তাহলে কারণ মালা অলংকার হবে—

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এই অলংকারটির সঙ্গে ইংরাজী Climax অলংকারের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

একাবলী

প্রথমে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দটির পরে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, পরের শব্দটি যদি ঐ প্রথম শব্দটির "বিশেষণ" রূপে ব্যবহৃত হয় তাহলে একাবলী অলংকার হবে।

১) "ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।" কৃত্তিবাস।

২) শমনদমন রাবণরাজা রাবণ-দমন রাম
শমন ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।

সার

বক্তব্য বিষয় যদি উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভ করে তাহলে সার অলংকার হবে।

"দর্শনে জাগায় আকর্ষণ, আকর্ষণ জাগায়
অনুরাগ, অনুরাগে হয় প্রেম, প্রেম ঘটায় মিলন।"

গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলঙ্কার

অপ্রস্তুত প্রশংসা

অপ্রাসঙ্গিক থেকে অর্থাৎ যে বিষয়টি বর্ণনীয় নয় তা থেকে প্রংশের দ্বারা যদি বর্ণনীয় বিষয়ে বিশেষবোধ জন্মে তা'হলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকার হবে।

১) "নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে।" মধুসূদন।

২) "কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা' বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়।" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

অধমের আচরণ উত্তমে অনুসরণ করে না, এটাই হচ্ছে কবির বক্তব্য এর পরই কবি অবতারণা করেছেন কুকুর ঘটিত বিশেষ ব্যাপারটির।

৩) "অনেক মালতী আছে বাংলা দেশে—
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসী জার্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।" রবীন্দ্রনাথ।

জ্ঞানের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের সার্থকতা নয়, নারীত্বের চরম বিকাশই হচ্ছে বাংলা দেশের মালতীদের।

অর্থান্তর ন্যাস

সামান্য বক্তব্যের দ্বারা যদি বিশেষ বক্তব্যের অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন ঘটানো হয় তবে অর্থান্তর ন্যাস অলংকার হবে।

১) "এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" রবীন্দ্রনাথ।

২) "চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

৩) সবই যায়, কিছুই থাকে না, শধু কীর্তিই থাকে,
বঙ্কিম গিয়াছেন কপাল কুণ্ডলা আছে।

৪) "মুরলী সরল হ'য়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছ বাঁকার স্বভাব।"

ব্যাজস্তুতি

নিন্দাব ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা যখন বাক্যে প্রকাশিত হয় তখন তাকে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলা হয়। এই অলঙ্কারটি ইংরাজী অলঙ্কার Irony সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও Irony তে ক্রুর ভাব রয়েছে এতে তা নেই।

১) "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে" মধুসূদন।
(সাগর বন্ধনকে লক্ষ্য কবে বলা হযেছে)।

২) "অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন,
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমাব সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ" ভারতচন্দ্র

স্বভাবোক্তি

বস্তুস্বভাবের যথাযথ এবং সুক্ষ্ম বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি বলা হয়। এই উক্তিতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতেই হবে। বস্তুস্বভাবের যথাযথ বিবরণ দিলে বর্ণনা হবে, কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে না। সত্যিকারের স্বভাবোক্তির সঙ্গে ঘটে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার একীকরণ—অর্থাৎ হতে হবে "চিত্তবৃত্তি সংবাদ"।

"পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।"

বস্তু-স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা হলে অলঙ্কার হয়নি, বা এ ধরণের স্বাভাবিক বর্ণনা

কোনদিন "চিত্ত-চমৎকৃতি" হবে না।

১) "কপোতদম্পতী

বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে

ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসর কালে

নিভৃতে করিতেছিল বিহবল কূজন" রবীন্দ্রনাথ।

বস্তুস্বভাবের স্বাভাবিক বর্ণনা হয়েও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করার জন্যই অলংকার (স্বভাবোক্তি) হয়েছে।

তাই আচার্য দণ্ডী অলংকারকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে বলেছেন—

"নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃণ্বতী

স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কৃতির্যথা" কাব্যাদর্শ ২/৮

আলংকারিকদের মত বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে, অলংকার দ্বিবিধ— স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি। বক্রোক্তিকে আচার্য কুন্তক একটি নির্দিষ্ট স্থান দিয়েছেন। দণ্ডী বক্রোক্তি বলতে স্বভাবোক্তির বিপরীত অলংকার ধরে নিয়েছেন এবং শ্লেষই বক্রোক্তির সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে—

"শ্লেষঃ সর্বাসু পুষ্ণাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রিয়ম্

ভিন্নং দ্বিধা স্বভাবোক্তির্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙময়ম্"

স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি সাধারণতঃ এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে না। স্বভাবোক্তি সহজ সরল এবং বক্রোক্তি ঐশ্চর্যে আড়ম্বরে গর্বিত। তবুও অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে উভয়েই একত্রে সহবাস করছে—

১) "ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে

বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে

নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম" মধুসূদন।

পূর্ণোপমা অলঙ্কার সন্দেহ নেই—স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা থাকাতে একে স্বভাবোক্তি অলংকারও বলা যেতে পারে।

২) "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে

শঙ্কিত ভবদুপযানম্ জয়দেব।

৩) "দিবস রজনী, আমি যেন কার

আশায় আশায় থাকি।

তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই
'কে আসিছ' বলে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখি।"

২) এবং ৩) উদাহরণে আমরা পাচ্ছি—প্রতীক্ষমানা এবং উৎকণ্ঠিতা নারী হৃদয়ের বেদনাঘন চিত্র। একে স্বভাবোক্তি বলা যেতে পারে।

স্বভাবোক্তির মধ্যে সৌন্দর্য ও সুষমা থাকায় আচার্য দণ্ডী একে আদি অলংকার বলেছেন। একে, যে নারীর অবয়ব গঠন নিখুঁত এবং যৌবনদীপ্তিতে দীপ্যমানা, সেই দীপ্তি—অলংকারের কোনো অপেক্ষা ঐ দীপ্তিই হচ্ছে– ঐ সুষমা-মণ্ডিত নারীদেহের স্বাভাবিক অলংকার—ইহা স্বভাবোক্তি অলংকার—ইহাই 'ধ্বনি'। পাশ্চাত্য দেশেও এই মতবাদ স্বীকৃত হয়েছে—"**Nay, the simplest truth is often so beautiful and impressive of itself, that one of the greatest proofs of his genius consist in his leaving it to stand alone, illustrated by nothing but the light of its own tears or smiles, its own wonder might, or playfulness" What is Poetry ?**

আক্ষেপ

যে কথাটি বলার ইচ্ছা, সে কথাটি সোজাসুজি না বলে নিষেধের আভাসের মধ্য দিয়ে যদি সে কথা বলা হয় এবং তা যদি চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আক্ষেপ অলংকার হবে।

১) পিরীতি-মূরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান-কোণে। — চণ্ডীদাস।

২) কি করব জপতপ দানব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুলশীল ধন-জন-যৌবন
কি করব লোচনহীনে। — চম্পতি।

৩) মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে ? — রবীন্দ্রনাথ।

বাংলায় ব্যবহৃত অপর কয়েকটি অলঙ্কার

তুল্যযোগিতা

উপমেয় (প্রস্তুত) অথবা উপমান (অপ্রস্তুত) বস্তুগুলোকে যদি একই ধর্ম বা গুণের ক্রিয়া বেঁধে রাখে তা'হলে তুল্যযোগিতা অলংকার হবে।

১) "কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান,
কপালে দিয়াছে 'চুম্ব' শিরে 'দুর্ব্বাধান'।" — গোবিন্দ দাস।

'চুম্ব' এবং দু'র্ব্বাধান' এই বস্তুদুটোকে একই সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একই ক্রিয়া **"দিয়াছে"** দিয়ে।

২) শুধু "রবে" **অন্ধপিতা, অন্ধপুত্র** তার
আর কালান্তর **যম**—শধু **পিতৃস্নেহ**
আর বিধাতার **অভিশাপ**।" — রবীন্দ্রনাথ।

এক 'রবে' ক্রিয়া দিয়ে পাঁচটি প্রস্তুতকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

দীপক

প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুত দু'টোকে একই ধর্মের বন্ধনে বাঁধলে দীপক অলংকার হবে।

ধর্মের **বন্ধন তুল্যযোগিতাতেও** রয়েছে; তবে সেখানে বাঁধা পড়ে হয় **প্রস্তুত** **না হয় অপ্রস্তুত, কিন্তু দীপকে** বাঁধা পড়ে **প্রস্তুত** এবং **অপ্রস্তুত** দুটোই—

১) শক্তির আধার বটে নদী আর নারী
পিপাসাবারিণী জীবনদায়িনী। — অমৃতলাল বসু।

প্রস্তুত 'নারী', অপ্রস্তুত – 'নদী'—'পিপাসাবারণ' আর 'জীবন দান' রূপ একই ধর্মে বন্ধ হয়েছে।

২) "সময় সমীর নীর, মেঘ, বৎস, নহে স্থির'। — গিরিশচন্দ্র।

প্রস্তুত—'সময়', অপ্রস্তুত—'সমীর, নীর, বন্ধনকারী ধর্ম 'নহে স্থির'।

সহোক্তি

উপমেয় উপমানের একটি প্রাধান্য দিয়ে সহার্থক শব্দযোগে যদি দুটোকে বাঁধা হয় তা'হলে সহোক্তি অলঙ্কার হবে।

১) চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি

পরাণ **সহিত** মোর। চণ্ডীদাস।

রাধা চান করে তাঁর নীলশাড়ী নিঙ্‌ড়াতে নিঙ্‌ড়াতে যাচ্ছেন—কৃষ্ণ রাধাকে দেখে হৃদয়ে ঐ শাড়ী নিঙ্‌ড়ানর মতো বেদনা অনুভব করছেন। এই মোচ্‌ড়ানো অর্থ নিঙ্‌ড়ানো থেকে প্রতীতি হচ্ছে—**'সহিত'** শব্দ-যোগে।

২) হৃদয়-স্পন্দন **সনে** ঘুরিছে জগৎ

চলিছে সময়। অক্ষয়কুমার বড়াল।

৩) গত বসন্তের মতো মৃতপুষ্প **সাথে**

ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু

আদরে মরিত তবে।

অনন্বয়

একই বস্তু যদি উপমেয় এবং উপমান হয়, তা'হলে অনন্বয় অলংকার হবে।

"তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল" গিরিশচন্দ্র।

শ্লেষ (অর্থ)

যেখানে শব্দগুলো দুটো অর্থ প্রকাশ করে অথচ শব্দপরিবর্ত্তনেও অলংকার অক্ষুন্ন থাকে, সেখানে অর্থশ্লেষ অলংকার হয়—

১) অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচরে ব্যাপ্ত আছে, যেবা

তাহারে দেখান যিনি, গুরু তিনি কর তাঁর সেবা। শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

১) এক অর্থে 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' ঈশ্বরকে যিনি দেখান, সেই গুরুর সেবা কর। ২) আর একটি অর্থ হ'ল–যা খণ্ড নয়=গোলাকার, জগৎ যে সর্ব্বত্র ঘুরছে (অর্থাৎ 'টাকা',) তাকে যিনি দেখান অর্থাৎ উপার্জ্জনের পথ দেখিয়ে দেন, সেই গুরু (স্কুল-কলেজের অধ্যাপক), তাঁর সেবা কর।

পরিবৃত্তি

দুটো বস্তুর বিনিময় হলে পরিবৃত্তি অলংকার হবে—

১) তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন

কিনেছি বিশাখা জনে। চণ্ডীদাস।

যৌবনের বিনিময়ে রাধা কৃষ্ণকে কিনেছেন।

২) "কিনিলে রাঘব কুলে আজি নিজ গুণে গুণমণি" মধুসূদন।

নিজগুণে গুণমণি রাঘবকে কিনেছেন।

সূক্ষ্ম

আকারে ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির বোধগম্য নয় এমন সূক্ষ্মবস্তু-বোধে সূক্ষ্ম অলংকার হয়—

১) কখন মিলন হবে শুধানু যখন
হাসি প্রিয়া লীলাপদ্ম কৈল নিমীলন। শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

পদ্ম মুদিত হয় রাত্রে, দিনের বেলা থাকে উন্মীলন—সুতরাং সংকেতে প্রিয়া জানাল—রাত্রিতে মিলন হবে।

২) সুরজ সিন্দুর বিন্দু চাঁদনে লিখএ ইন্দু
তিথি কহি গেল তিলকে
বিপরীত অভিসার অমিয় বরিস ধার
অংকস কএল অলকে। বিদ্যাপতি।

রাধা, কপালে সূর্য্য, চাঁদ এঁকে পাশে চৌদ্দটি ফোঁটা (তিলক) দিয়ে সূর্য্য ও চাঁদকে কেটে দিয়েছেন—অর্থাৎ দিনের বেলা নয়, জ্যোছনা রাত্রে—কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রাত্রে তিনি অভিসারে যাবেন।

ব্যাজোক্তি

কোনো গোপনীয় ব্যাপার কাজে প্রকাশ হলেও যদি ছলনা করে তাকে গোপন করা হয় তা'হলে তা ব্যাজোক্তি অলংকার হবে—

"তঁহি পুন মোতিহার টুটি কেবল
কহত হার টুটি গেল
সভজন এক এক চুণি সঞ্চরু
শ্যামদরশ ধনি কেল।" বিদ্যাপতি।

রাধা সখি ও শাশুড়ী ননদিনীর সঙ্গে যমুনায় স্নান করে আসছেন—পথে রয়েছেন কালা-চাঁদ। কিন্তু মুস্কিল রাধা নয়নভরে কি করে দেখেন—অথচ বাকী সবাই রাধাকে লক্ষ্য করছেন—রাধাও চোখ ফেরাতে পারছেন না, তিনি হঠাৎ বুদ্ধি করে বসে গোপনীয় ব্যাপারটিকে গোপন রাখার জন্য—তাঁর গলার মোতির মালাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে বললেন আহা মালাটি ছিঁড়ে গেল—সবাই দেখলেন সত্যিই—তাঁরা মোতি-গুলো তুলে নিতে বসে পড়ল আর সেই ফাঁকে রাধা কৃষ্ণকে প্রাণ ভরে দেখে নিয়ে

সত্যটাকে গোপন করলেন।

পাশ্চাত্য অলঙ্কার

বাংলা সাহিত্যে বহু পাশ্চাত্য অলংকার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অথচ সেই ব্যবহৃত পাশ্চাত্য অলংকারগুলোর বাংলা কোনো নামকরণ করা হয়নি। "অলংকার-চন্দ্রিকা" গ্রন্থের প্রখ্যাতনামা লেখক শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী পাশ্চাত্য অলংকারের বাংলা নামকরণ তাঁর সেই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তীর 'অলংকার চন্দ্রিকা' থেকে কয়েকটির উদাহরণ তুলে ধরা হল।

Asyndeton (অত্যযুক্ত)

সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা না হলে এই অলংকার হবে—

"হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী
পদাতিক যমজয়ী" মধুসূদন।

Polysyndeton (অতিযুক্ত)

এই অলংকারটি পূর্ব অলংকারের বিপরীত অলংকার—

১) আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের— প্রেমেন্দ্র মিত্র

Onomatopaeia (ধ্বনিবৃত্তি)

স্বর ও ব্যঞ্জনের ভাবানুকারী ধ্বনির নাম ধ্বনিবৃত্তি—

১) "গুরু গুরু মেঘ গুমরি
গরজে গগনে গগনে" রবীন্দ্রনাথ।

Metonymy (অনুকল্প)

১) সেক্‌সপীয়র বড় বেশী পড়িতাম বঙ্কিমচন্দ্র।

Euphemism (মঞ্জুভাষণ)

কঠিন কথাকে কোমল করে বলা—

১) বিক্রম— "দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ।
দেবদত্ত— মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে
তাই সেথা নৃপতির পাইনে দর্শন।" রবীন্দ্রনাথ।

মন্ত্রগৃহে রাণী নেই, রাজা স্ত্রৈণ, তাই কড়া কথা ঘুরিয়ে মিষ্টি করে বলা হয়েছে।

Innuendo (বক্রভাষণ)

"নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিষ্টভাষী
থাকেন বিজয় কোটে, মুখে লেগে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে ;
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে,
যাহাকিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি"

লোকটি যে ভদ্র বেশী 'চোর' সে কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে।

Anticlimax (Bathos—নিকর্ষ)

উচ্চ থেকে নীচে নেমে আসা—

"জাত গেল, ধর্ম গেল, মান গেল, পোষা শালিকটা পর্যন্ত গেল।"

শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

Climax (অনুলোম)

জয়সিংহ— প্রভু কারে অপমান ?
রঘুপতি— কারে ! তুমি আমি, সর্বশাস্ত্র,
সর্বদেশ, সর্বকাল, সর্বদেশ-কাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে অপমান।"

রবীন্দ্রনাথ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মধুসূদনের কবিমানস

"মাইকেল মধুসূদন" গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

"মধুর কাব্যজীবন এই দুস্তর সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত। তাহার এক পারে ভারতবর্ষ—কবিগুরু বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, আর অপর পারে হোমার, ভার্জিল, মিলটন; মধুর কাব্যজীবন এই দুই পারের মধ্যে নিরন্তর পারাপারে নিরত।" অধ্যাপক বিশীর উক্তি—যথার্থ। কিন্তু পারাপারের মধ্যে কোন্ পারে তাঁর কাব্যের সোনার-তরী ভিড়েছিল—সেটাই হচ্ছে বিবেচ্য।

মধুসূদন ছিলেন হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র। তাঁর শিক্ষা হয়েছিল—ডিরোজীয়, রিচার্ডসন, মার্সম্যান প্রমুখ ইংরাজ অধ্যাপকদের অধীনে। আহারে বিহারে মধুসূদন তাঁদের অনুসরণ করেছেন; এমনকি রিচার্ডসনের ফ্যাশনে মধুসূদন সেলুনে গিয়ে পনের শিলিং দিয়ে চুলও ছেঁটেছেন।

বিদেশী শিক্ষকের শিক্ষা-দীক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব মধুসূদনের প্রতিভায় "বায়রণী আগুন" ধরেছিল। তারই ফলে সাগর-দাঁড়ির দত্তকুলোদ্ভব কবি মধুসূদন হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়তার স্পর্শ থেকে একেবারেই মুক্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে বিশ্বাস অনেক সুধী সমালোচকের রয়েছে। তাঁদের এই বিশ্বাসের মধ্যে কোনো যুক্তি রয়েছে কিনা তাই বিবেচ্য।

মধুসূদনের অন্তরে ছিল দ্বন্দ্ব—একদিকে প্রাচ্য অপরদিকে প্রতিচ্য। নবশিক্ষায় শিক্ষিত মধুসূদন মেতে উঠেছিলেন—বিদ্রোহী হয়ে। তিনি পয়ার ও লাচাড়ীর শৃংখল থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করে ছন্দোরীতিতে নোতুনত্বের আমদানি করেছেন। কাব্য রচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— shall not allow my self to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya Darpan."

মধুসূদন "বাসনা-সংস্কার" এর বিরুদ্ধাচরণ করে রাবণকে করেছেন Grand fellow এবং বিভীষণ হয়েছে দেশদ্রোহী Scoundrel । মেঘনাদ বধের দেব-দেবীর চরিত্রগুলো গ্রীক ও ইউরোপীয় সাহিত্যের জুপিটর, জুনো, জিউস প্রভৃতির কিছুটা সগোত্র হয়ে পড়েছেন। লক্ষ্মী বাহ্যদৃষ্টিতে গ্রীক্ ভাবাপন্ন হলেও লংকার সমূহ বিপদের সময় ম্লান-মুখী হয়ে পড়েছেন এবং লক্ষ্মীর ঐ মূর্তি গোড়-জনের বিজয়া-প্রভাতের চিন্তাকুলা উমা-চরিত্রের সহোদরা রূপেই প্রতিভাত হয়েছেন।

মধুসূদন 'মাইকেল' হয়েও 'মঙ্গলঘটের' মহিমা বিস্মৃত হন নি। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তাও কবি ভোলেন নি—

"কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?"

মেঘনাদ বধ/ষষ্ঠ সর্গ।

"চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?" ঐ

অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মধুসূদন—হোমার, মিলটন, ভার্জিল, তাসমোকে যেমন অনুসরণ করেছেন, ঠিক তেমনি অনুসরণ করছেন— বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাসকে। তবুও মধু-কাব্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মধুসূদন ও হোমারের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যটি হচ্ছে একান্তই মানসিক।

হোমার মহাকবি, মধুসূদনকেও অনেকেই মহাকবি বলে অভিহিত করেছেন। মহাকাব্য মাত্রেই বীররসের স্থান প্রাধান্য লাভ করে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শৌর্য-বীর্য, জয়-পরাজয়ের কাহিনী মহাকাব্যের প্রাণবস্তু। বীরের সঙ্গে বীরের যেমন পার্থক্য রয়েছে ঠিক তেমনি এক মহাকাব্যের সঙ্গে আর এক মহাকাব্যের পার্থক্য আছে। দেশ, কাল, সমাজ ভেদেই এই পার্থক্য হয়ে থাকে। হোমারের মহাকাব্যের বীররসের আদর্শ উত্তরকালের মহাকাব্যের আদর্শের তুলনায় অনেকখানি আদিম ও অনার্য প্রকৃতির। বীরপূজা, বীরপ্রশস্তি ইলিয়ড-ওডেসির মর্মকথা। কিন্তু পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের ব্যবধানটি স্বীকৃত হয়নি। ফলে এই বীর্যশৌর্যের মধ্যে আদিম অনার্য অসংস্কৃত রূপটিই পরিস্ফুট হয়েছে বেশি। ইলিয়ড মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইংরাজ সমালোচক Routh তাঁর God Man and Epic Poetry (পৃ-২৬) তে বলেছেন— "The subject of the Iliod is not the Trojan War, but the wrath of Achilles"

হেক্টর এচিলিসের চরিত্রের দুরন্তপনা, দুর্দান্ত প্রবৃত্তি-প্রভাব, রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতি চরিত্রে থাকলেও এঁদের আন্তরধাতু পৃথক। কারণ মধুসূদনের রাবণ, মেঘনাদ বীর হলেও প্রকৃতিতে হিংস্রতা উগ্রতা নেই। এখানে বুদ্ধির সঙ্গে বিবেকের, শৌর্যের সঙ্গে ন্যায়, ধর্ম ও নীতিবোধের সংযোগ উপেক্ষণীয় নয়। অর্থাৎ গ্রীক্ সাহিত্যের বীরত্ব এবং বাংলা সাহিত্যের বীরত্ব এক ধাতুতে, এক ছাঁচে গড়া নয়। রাবণ, মেঘনাদের বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, যুযুৎসা, জিগীষার অন্তরালে একটি বলিষ্ঠ মানবতা, জাতীয়তা, সামাজিকতাবোধ নিহিত। এঁদের ধ্যান-ধারণার প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির যোগ রয়েছে। এঁদের ভোগও রয়েছে, ত্যাগও রয়েছে, ঔদ্ধত্যও আছে, বিনয়ও আছে। যেমনি অহংকার তেমনি অনুতাপও রয়েছে—

"কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু হৈম-গেহে ?" মেঘনাদ বধ ১ম সর্গ।

হোমারের কোনো চরিত্রই এভাবে অনুশোচনা করেননি। হোমারের কাব্যে বীর-পূজার অসংস্কৃত আদর্শই রূপপরিগ্রহ করেছে। কবি বীর চরিত্রের পশুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার জন্য সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুরন্ত চরিত্রের উগ্র ও উদ্ধত রূপেই স্তুতি করেছেন—

Trojans and Greek now gather round the slain ;

তুলনীয়— "হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।" মধুসূদন/মেঘনাদ বধ।

"As when the windo with razing flames conspire
And o'er the forests roll the flood of fire."

তুঃ— "বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানর শ্বাসরূপে, জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি,"

Thus like rage of fire the Combat burns,
And now it rises, now it sinks by Turns.

তুঃ "চলিলা অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।" মেঘনাদ বধ/৩য় সর্গ।

উপমা অলঙ্কার সৃজনে মধুসূদন হোমারের মতই দাবাগ্নি, কালাগ্নি প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মধুসূদন গ্রীক কবির প্রতিধ্বনি হয়ে পড়েন নি কোনোদিনই। অগ্নিচরিত্রের "Ruthlesness" বা নৃশংসতার আড়ালে তাঁর শুচি-শুভ্র রূপটি প্রতি পদেই ফুটে উঠেছে—

"আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী,
পবিত্র, হে সর্বশুচি, তোমার পরশে
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষস-দম্পতি।" মেঘনাদ বধ/৯ম সর্গ।

মধুসূদন বলেছেন—

"As a Jolly Christian Youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors" তাই দেখতে পাই অলঙ্কার প্রয়োগে মধুসূদন বাহ্যতঃ Jolly Christian Youth কিন্তু অন্তরে ভারতীয় সংস্কৃতিতে একেবারে ভরপুর—

"জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
কর পদ্ম-সঞ্চালনে।" মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সর্গ।

"করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আদ্র-অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।" মেঘনাদ বধ/৯ম সর্গ।

মধুসূদনের কাব্যে প্রেম-প্রৌঢ়া নায়িকা সূর্যমুখীর সহোদরা এবং ধুতুরার শুদ্ধ-সত্তা, যোগিনীর প্রতীক। এই দুই পুষ্পচরিত্রের মধ্য দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে কবির অন্তরের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার রূপটি প্রস্ফুটিত—

"বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষ-কুল-রাজা,
রাবণ, বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরি
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে।" মেঘনাদ বধ/৯ম সর্গ।

"যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্যমুখী, ও চরণে রত
এ মনঃ" বীরাঙ্গনা (পুরূবার প্রতি উর্বশী)।

কর্ণিকা ফুল সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

> "হায়, কর্ণিকা অভাগা।
> বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে
> সতীত্ব বিহনে যথা যুবতী যৌবন।" তিলোত্তমা—১ম।

রূপমবর্স্ব কর্ণিকার কোনো সৌরভ নেই ; সুতরাং কর্ণিকা সতীত্ব বিহীন যুবতী নারী। এ কল্পনা পাশ্চাত্য দেশের নয়—একান্ত ভাবেই ভারতীয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের ভাবধারা সম্পর্কে "To the Youth of India" গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ (পৃ-১৫৩) বলেছেন—"The Western man is body at first, and then has a soul ; with us a man is a soul and spirit, and he has a body."

কালিদাস : মধুসূদন :

পুষ্প-চরিত্রের মধ্য দিয়ে কালিদাস ভারতীয় মানব চরিত্রের আভ্যন্তরীণ রূপটিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, মধুসূদনও ঠিক তেমনি ভাবে তুলে ধরেছেন। মধুসূদন সজ্ঞানে কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন—

> ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুঃ
> তপঃক্লমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি
> ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারায়া
> শমীলতং ছেত্তুমৃষির্ব্যবসতি।" শকুন্তলা/১ম অংক।

তুঃ অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ? মেঘনাদ বধ ১ম সর্গ।

কালিদাসের উপমায় হাতীর স্থান অগ্রগণ্য। হাতীর শক্তির সঙ্গে হাতীর সুষমাটুকুর উল্লেখ তিনি যেভাবে করেছেন, মধুসূদনও অনুরূপ করেছেন—

> সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা
> তেন সিংহাসনং পিত্র্যমখিলঞ্চারিমণ্ডলম্। রঘু/৪/৪।

তুঃ "নব মাতঙ্গিনী-গতি চলিয়া রঙ্গিনী" মেঘনাদ বধ/৩য় সর্গ।
"এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে।" মেঘনাদ বধ/২য় সর্গ।

কালিদাসের কাব্যে 'মৃগের' আসন যেমন, মধু কাব্যেও অনুরূপ—

"মধ্যে ক্ষামা, চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ" মেঘদূত/উত্তরমেঘ।

তুঃ "গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী
মৃগাঙ্গী পীবরস্তনী সুবিম্ব অধরা।" তিলোত্তমাসম্ভব/১ম।

কালিদাসের মত অর্থান্তরন্যাস মধুসূদনও করেছেন—

"প্রতিকার বিধানমায়ুষঃ সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে" রঘু/৮/৪০।

তুঃ "মাটি কাটি দংশে সর্পে আয়ুহীন জনে" মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ।

"যাঞ্চা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা" মেঘদূত পূর্ব/৬।

তুঃ "অধমে, মা, অধমের গতি
ধিক যাঞা—ফলবতী নীচ-কাছে।" তিলোত্তমাসম্ভব/৪র্থ।

কাকু বক্রোক্তি—

"ক ঈপ্সিতার্থ স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ?" কুমারসম্ভব/৫/৫।

তুঃ কে পারে ফিরাতে প্রবাহে ?
বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?

বীরাঙ্গনা (দশরথের প্রতি কৈকেয়ী)।

সমধর্মী ও সমমর্মী উপমা—

শশাংক লেখামিব পশ্যতো দিবা সচেতসঃ কস্য
মনো ন দূয়তে ? কুমারসম্ভব/৫/৪৮

তুঃ রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য কার না বিদরে
হৃদয় ? মেঘদাদ বধ/৫ম সর্গ।

কালিদাসের কাব্যে নারী চরিত্রের সঙ্গে বীণা যন্ত্রটি যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, মধু-কাব্যেও তাই দেখতে পাই—

"অংকমংক পরিবর্তনোচিতে তস্য নিন্যতুরশূন্যতামুভে।
বল্লকী চ হৃদয়ঙ্গম-স্বনা বল্গুবাগপি চ বামলোচনা।"

রঘু/১৯/১৩।

তুঃ "নীরবিলা, বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি।" মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সর্গ।

কালিদাসের কাব্যে—নদীর মধ্যে গঙ্গা, পুষ্পের মধ্যে পদ্ম, অগ্নির মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নি বা মহাদেবে ললাটাগ্নি উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের মধ্যেও তাই দেখতে পাই—

"হৈমীফলং হেমগিরের্লতেব বিকস্বরং নাকনদীব পদ্মম্
পূর্বে দিঙ্‌নুতনামিন্দুমাভাবাৎ তং পার্বতী নন্দনমাদধানা।"

কুমারসম্ভব/১১/২৬।

"যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝড়ে পুতে বারিধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি সরমারে।"

মেঘনাদ বধ/৪র্থ সর্গ।

বাল্মীকি ব্যাসদেবের অনুসরণ মধু কাব্যে থাকলেও অলংকার প্রয়োগে মধুসূদন কালিদাস পন্থী। তিনি নিজেই বলেছেন—"...... to read Kalidas and that, I think is quite enough for me"

কালিদাস সম্পর্কে K S. Ramswami Sastri তাঁর 'Kalidas' শীর্ষক গ্রন্থে "বলেছেন—In short Asia is the heart of the world, India is the heart of Asia, and Kalidas is the heart of India."

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেছেন—"Nobody understands Asia who does not understand Kalidasa—the spirit of Asia"
বাংলার 'পাল-পার্বণ' মধুকাব্যে বিশেষ ভাবেই চিত্রিত হয়েছে—

"বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা"

* * *

দেবদোলোৎসব বাদ্য দেবদল যবে
আবির্ভাব ভবতলে, পুজেন রমেশ!"

মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সর্গ।

"ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিবাদে দেবী, বসেন যেমতি
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে..........." মেঘদাদ বধ/১ম সর্গ।

"যেয়োনা রজনী আজি লয়ে তারাদলে
তুমি গেলে দিনমণি এ পরাণ যাবে"   চতুর্দশপদী/বিজয়াদশমী।

বাঙালি মধুসূদন ঃ মাতৃকল্পনা ঃ

"জননীর স্নেহ তার প্রতি সমধিক"   মেঘনাদ বধ/১ম সর্গ।

"দেহ দেখা পুনঃ, পুজি পা দুখানি
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়..........."   মেঘনাদ বধ/৫ম সর্গ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুসূদন সম্বন্ধে বলেছেন—"Few Hindu authors can stand near this man, and his imagination goes as far as imagination can go."

জাতীয়তাবোধ ঃ মধুসূদন ছিলেন জাতীয়তাবাদী কবি। তাঁর রচনায় জাতীয়তাবোধ ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে—

"শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা"   মেঘনাদ বধ/৬ষ্ঠ সর্গ।

"জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শতধিক তারে।"   মেঘনাদ বধ/১ম।

জহুরী বঙ্কিম জহর চিনেছিলেন ঠিক্। তাই তিনি বলেছিলেন—"সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন'।"

আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও আশা করি কবি শ্রীমধুসূদনকে চেনা কঠিন হয়ে পড়েনি এবং আমরা আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে পেরেছি। যাঁরা বলেন সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে মধুসূদনের ঋণ ষোল আনাই বহিরঙ্গ তাঁদের এই উক্তি যে কত ভ্রান্ত তা নোতুন করে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করিনে। প্রখ্যাত সমালোচক সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি বলেছেন—

"মেঘনাদবধের ৬ষ্ঠ সর্গ বাঙ্গালীর জীবনবেদ হউক। * * * আজন্ম বিদেশী অন্নে শিক্ষিত, বিজাতীয় ধর্মে শিক্ষিত, বিদেশের ভাষায়, চিন্তায়, ভাবে, সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হইয়াও মধুসূদন স্বদেশীতন্ত্র বিস্মৃত হন নাই। স্বদেশের ভাষায়, ভাবে তাঁহার শুধু অনুরাগ নয়, সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও সমবেদনার সংগমে দেশ-বাৎসল্যের স্বর্গীয় কহ্লার সহস্রদলের বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কহ্লারের সৌন্দর্যে, সৌরভে বাঙ্গলার সাহিত্য ও সমাজ মাতিয়া উঠিয়াছিল।"

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সূচী

সংস্কৃত

আনন্দবর্ধন— ধ্বন্যালোক।

উদ্ভট— কাব্যালংকার সারসংগ্রহ।

কুন্তক— বক্রোক্তিজীবিত।

দণ্ডী— কাব্যাদর্শ।

ধনঞ্জয়— দশরূপক।

বিশ্বনাথ— সাহিত্যদর্পণ।

বামন— কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি।

ভামহ— কাব্যালংকার।

বাংলা

অতুলগুপ্ত— কাব্য জিজ্ঞাসা।

অজয় চক্রবর্ত্তী— সাহিত্যদর্শন।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়— বাংলা ছন্দের মূলসূত্র।

আনন্দমোহন বসু— বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ।

প্রবোধচন্দ্র সেন— ছন্দ পরিক্রমা।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য— সাহিত্য মীমাংসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— ছন্দ।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়— পদাবলী পরিচয়।

সুকুমার সেন— ভাষার ইতিবৃত্ত।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত— কাব্যবিচার।

সুবীর কুমার দাসগুপ্ত— কাব্যালোক।

শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী— অলঙ্কার চন্দ্রিকা।
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য— মধুসূদনের কাব্যালঙ্কার ও কবিমানস।

ইংরাজী

Aristotle— The Poetics.
Carlyle— The hero as Poet.
Croce. B— Aesthetic
Dunton W— What is poetry.
Shelly— A defence of poetry,

গ্রন্থকারের রচিত অপর গ্রন্থ

১। Literature in Kamata—Kochbihar Raj-Darbar from 14th to 18th Century (approved thesis for the Ph. D, Degree)

২। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ— (ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত)

৩। ভবানী মঙ্গল—রামনারায়ণ কৃত।
৪। বিজ্ঞাসুর প্রস্তাব—ইন্দ্রকান্ত দেব শৰ্ম্মণ।
৫। হরি বংশের কবি ও ভবানন্দের পরিচয়।
৬। মাণিক্য মিত্রের কথা—দ্বিজ উমানাথ বিরচিত।
৭। সাধন সঙ্গীতে বাংলার মুসলমান কবি।
৮। সোনারায়ের গান।
৯। কায়া ও ছায়া (গল্প সংকলন)
১০। শিল্পীর মৃত্যু (ঐ)
১১। নাগেশ্বরী (উপন্যাস)
১২। পটপরিবর্তন (ঐ)
১৩। ঘুম নেই (ঐ)
১৪। মহাকবি (নাটক)

১৫। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১৬। সাহিত্যদর্শন। (সমালোচনা)

১৭। সিরাজদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্র) সম্পাদিত।

অসমীয়া ভাষায় লেখা

১৮। সপ্তলিপি (গল্প সংকলন)

১৯। নাগেশ্বৰী (উপন্যাস) (যন্ত্রস্থ)

২০। ছন্দ-অলঙ্কাৰ আৰু ধ্বনি (যন্ত্রস্থ)

২১। হেমসরস্বতী বিরচিত পুরাণের অনুবাদ (যন্ত্রস্থ)

———